কারী মুহাম্মদ তায়্যিব [রহ.]

কুরআন-হাদীসের আলোকে

# ইসরাইল

কারী মুহাম্মদ তায়্যিব [রহ.]

কোরআন-হাদীসের আলোকে

# ইসরাইল

অনুবাদ

মাওলানা হাবীবুর রহমান

মুহাদ্দিস তেজগাঁও মাদ্‌রাসা, ঢাকা

সম্পাদনায়

আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া

ভাইস প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস

জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আখতার

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ইং
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৭ ইং

কোরআন-হাদীসের আলোকে **ইসরাইল** ■ প্রকাশক হাফেয মাওলানা আহমদ আলী ■ স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত ■ প্রচ্ছদ :নাজমুল হায়দার ■ বর্ণবিন্যাস আল-আশরাফ কম্পিউটার্স, ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। মোবাইল ০১৭১৮৫২৭১০২

মূল্য ৪৮ টাকা

**ISBN : 984-70136-0015-2**

# সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে "উম্মাতও ওয়াসাতান" বা মধ্যমপন্থী উম্মত হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন। দরূদ ও সালাম আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর আসহাব ও অনুগামীদের উপর যাঁরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েও ইয়াহুদীদের নখর থাবা ও কূট-ষড়যন্ত্রে ক্ষতবিক্ষত।

বস্তুত ইয়াহুদীরা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ধর্মানুসারী এক সম্প্রদায়। বনী ইসরাইলে ইয়াহুদী ছিলেন একজন প্রভাবশালী গোত্রপ্রধান। যবুরের বর্ণনানুসারে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার শীর্ষ নেতৃত্বের পদেও সমাসীন ছিলেন। তার উত্তর-পুরুষরাই ইয়াহুদী নামে খ্যাত। হযরত মুসা (আ.)-এর ধর্মানুসারী হওয়ার দাবীদার হলেও পরবর্তীকালে ইয়াহুদীরা ধূর্তামী ও কূট-ষড়যন্ত্রে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে যায় এবং এক জঘন্য ও ধিকৃত সম্প্রদায় হিসাবে খ্যাত হয়ে পড়ে। ধোঁকা, প্রতারণা অন্যায় ও অপকর্মের এমন কোন দিক ছিল না যাতে তারা সিদ্ধহস্ত ছিল না। শোষণ ও মানুষকে নির্যাতনের নাম দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারেও তারা ছিল সকলের শীর্ষে। নৈতিক অধঃপতন ও চারিত্রিক হীনতার কারণে তারা গোটা মানব সম্প্রদায়ের নিকট ছিল ঘৃণিত ও ধিকৃত। আর আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন ও আল্লাহর নাফরমানির কারণে এ জাতি ছিল আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত।

আল্লাহর ক্রোধ ও মানুষের ঘৃণা সব মিলিয়ে তারা লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার এক অসহনীয় জীবন লাভ করে। সকলের দৃষ্টিতে নীচ ও হীন বলে ধিকৃত হল ও জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী জাতি হিসাবে কেউ তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত না। বরং সকলেই তাদেরকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত।

কুরআনে কারীমও তাদের এই অবস্থার চিত্রায়ণ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছে–

ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤبغضب من الله

তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও দারিদ্র অবধারিত করে দেওয়া হল এবং তারা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হল। (বাকারা-৬১)

আরো ইরশাদ হয়েছে–

فباؤ بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হল। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (বাকারা-৯০)

জাতি হিসাবে ইয়াহুদীরা ছিল সকলের কাছ থেকে বিতাড়িত এক জাতি। ফলে কেউ তাদেরকে আশ্রয় দিতেও সম্মত হত না। হযরত ইসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পর খৃষ্টান দুনিয়ার কাছে তারা পরাস্ত হয় এবং সেই যে তারা রাজ্য-ক্ষমতা হারায় তারপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা আর রাজ্য-ক্ষমতা ফিরে পায়নি। ষড়যন্ত্রকারী নীচাশয় জাতি হিসাবে তাদের যে পরিচিতি তাও তারা ঘুচাতে পারেনি। ফলে পৃথিবীর সভ্য জাতি ও সুশীল মানুষের কাতারে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় চরম অর্থনৈতিক দৈন্য ও মানসিক অভাববোধের মাঝ দিয়ে কেটেছে তাদের জীবন। কখনো মানসিক অভাবের তাড়নায় তারা পরিণত হয় এক চরম লোভী সম্প্রদায়ে। ফলে তাদের ন্যায়বোধ চিরতরে লুপ্ত হয়। শোষণ ও মিথ্যা প্রপাগান্ডার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন তাদের নেশায় পরিণত হয়। তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হত যে, তারা চরম অভাবী। এই হাভাত অবস্থা কোনকালেও তাদের থেকে দূরীভূত হবার নয়।

রাসূল (সা.)-এর পরবর্তীকালে মুফাসসিরগণের অনেকেই ضربت عيلهم الزلة। ব্যাখ্যা করতে যেয়ে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা সবসময় লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতে অর্থাৎ তারা রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হয়ে মাথাতুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর তাদের চরম অভাবের মাঝে জীবন যাপন– ১৯৪৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ঐসব মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা যথার্থ বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা, কুরআনে কারীম অবতরণের কাল থেকে এই দীর্ঘ সহস্রাব্দকাল পর্যন্ত ইয়াহুদীরা নিজেদের স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে পারেনি। তারা তাদের জন্য স্থায়ী কোন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে তারা নিজেদের জন্য একখণ্ড

আবাসভূমির সন্ধানে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে হন্যে হয়ে বেড়ায়। বৃটেন ও আমেরিকা তাদেরকে অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিজেদের ভূখণ্ডের একটি অঞ্চলকে তাদের জন্য বরাদ্দ করলেও অল্প দিনেই তাঁরা এই দু'মুখো জাতির হীনতার পরিচয় পেয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যে, এই জঘন্য মনোবৃত্তির অধিকার ষড়যন্ত্রপ্রিয় জাতিটি সহঅবস্থানের জন্য উপযুক্ত না হলেও কূট-ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এরা খুবই উপযুক্ত। তাই মুসিলম বিশ্বের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধি মূলক কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেওয়ার জন্য এ জাতিকে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে তাদেরকে মুসলিম বিশ্বের কোন এক অঞ্চলে পূনর্বাসনের দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়। মুসলিম বিশ্বের অসম্মতি সত্ত্বেও তারা তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে ঠেলে দেয় এবং রাজনীতিক সামরিক ও কূটনীতিক সহযোগিতা দিয়ে ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। বৃটেন ও আমরিকান পূর্ণসহযোগিতায় ১৯৪৬ সালে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে বিষ ফোঁড়ার ন্যায় ইসরাইল রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে যার যন্ত্রণায় গোটা মুসলিম বিশ্ব বলতে গেলে এক চরম অস্থিরতার মাঝে কালাতিপাত করছে।

১৯৪৬ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্রর জন্মের পর পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের এই তাফসীর যে, "ইয়াহুদীরা কোনকালেও রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করবে না" তা প্রশ্ন বাণে বিদ্ধ হয়। পূর্ববর্তীদের ঐ তাফসীরের কারণে অনেকের মনেই এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআনের আমোঘ ঘোষণার চিরন্তনতা কি তাহলে বিপন্ন হতে যাচ্ছে?

তাছাড়া আজকের পৃথিবীর বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে গেলে ইয়াহুদীদের হাতে। সে প্রেক্ষিতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও দারিদ্রকে চিরদিনের জন্য অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে বলে কুরআনের ঘোষণা রয়েছে– তার কোনটাই বাস্তবে বহাল থাকছে না।

১৯৪৬ সালের পর এ প্রশ্নটি অনেকের মনে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করে। সে প্রেক্ষিতে দার্শনিক বিচক্ষণ আলেমেদীন হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব (রহ.) কুরআনের ভাষ্য–ضربت عليهم الزلة এর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন ইসরাইল নামক পুস্তিকায় অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রজ্ঞার আলোকে। তাঁর এই ব্যাখ্যা দ্বারা ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কুরআনে

কারীমের উপরোক্ত ভাষ্যর তাৎপর্য এমনভাবে বিবৃত হয়েছে যা দ্বারা পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের উপর আরোপিত প্রশ্নের যেমন মীমাংসায় গেছে, তেমনি ভবিষ্যতের জন্যও ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে।

এই পণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তিকাটির আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিধায় এ পুস্তকটির আবেদন সর্বকালেই সমান থাকবে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এ পুস্তকের অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজন ছিল অনেক আগেই। তবে পুস্তকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি খানিকটা দুরূহ বলে অনুবাদের কাজটি সহজ ছিল না। উদীয়মান লেখক তেজগাঁও এর সনামধন্য মুহাদ্দিস আমার জামাতা মাওলানা হাবীবুর রহমান এ জটিল পুস্তকটির অনুবাদ করে আমাকে সম্পাদনা করে দিতে অনুরোধ জানায়। আমি মূল গ্রন্থকে সামনে রেখে শিরোনামগুলো সালিল করে দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছি। আশা করি বইটি বিষয়বস্তুর দুর্গম্যতা সত্ত্বেও পাঠকদের কাছে সাবলীল মনে হবে। এরূপ একটি তাৎপর্যপূর্ণ পুস্তকর সাথে আমার সামান্য শ্রম নিয়োজিত করতে পেরেছি বলে আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করিছ। ইতিপূর্বে ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র দেশে ও আল কুরআনের বৈপ্লবিক ভিত্তি নামে অনুবাদকের আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইয়াহুদী ষড়যন্ত্র কবলিত আজকের বিশ্বের জটিল প্রেক্ষাপটে তার এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। দুআ করি আল্লাহ তার এ শ্রম ও প্রচেষ্টাকে কবুলিয়াত দান করুন।

বিনীত

**আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া**

ভাইস প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস

জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ ঢাকা

# অনুবাদকের কথা

ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হওয়ার বিষয়টি দুই সহস্রাব্দের এক প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। ইতিহাস যুগে যুগে তাদের ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হওয়ার বিষয়টির উপর তাসদীক ও প্রত্যয়ণের মোহর এঁটে যাচ্ছে। আর তাই ক্রোধ বর্ষণ, অভিশাপ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ইয়াহুদী জাতির ললাট-লিখন। এ শুধু কুরআনে কারীমেরই দাবী নয়; বরং তাদের নিজস্ব ধর্মীয় গ্রন্থ তথা ইয়ারমিয়াহ নবীর গ্রন্থেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সেখানে বর্ণিত আছে– "আমি এমন আচরণ করবো যাতে ইয়াহুদীদের মাঝে কোন আনন্দের ধ্বনি, কোন উল্লাসের ধ্বনি, দুলহা-দুলহানের খুশি, চাক্কী পেষার আওয়াজ এবং প্রদীপের কোন রোশনী অবশিষ্ট না থাকে এবং সমগ্র পৃথিবীময় ইয়াহুদীরা ধ্বংস ও হয়রানির শিকার হয়।" (ইয়ারমিয়াহ -১২-৯-২৫)

অতএব, ইয়াহুদীদেরকে শাস্তি প্রদান এবং তাদের উপর ক্রমাগত ক্রোধ বর্ষণ শুধুমাত্র ইসলাম পরবর্তীকালের কথা নয়, বরং ইসলাম-পূর্ব দুই হাজার বছর থেকেই তা অবিরাম চলে আসছে। কিন্তু আল্লাহর এই অমোঘ বিধান যা আজ অকস্মাৎ বদলে গেছে এবং দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা ও চলে আসা প্রথার বিপরীতে ইয়াহুদীদের যে বাহ্যিক রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জিত হয়েছে, সে প্রশ্নেরই জবাব খোঁজা হয়েছে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গবেষণামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

আলোচ্য কিতাবে হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রহ.) এ বিষয়ের উপরই তাঁর জোরদার তেজদীপ্ত গভীর উদ্ভাবনী কলম থেকে কুরআনের হাকীকতসমূহের জট খুলে দিয়েছেন এবং ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্যকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন। আশা করি এ পুস্তক দ্বারা পাঠকরা এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করতে সমর্থ হবেন।

বিনীত

**মাওলানা হাবীবুর রহমান**

# সূচীপত্র

## ইসরাইলের রাষ্ট্র ক্ষমতা
## ও কুরআনে কারীম

ইয়াহূদীদের বর্তমান তথাকথিত রাষ্ট্রের কারণে (যা ইসরাইল নামে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে আরবের প্রাণকেন্দ্র তথা ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) কতক লোকের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। তাদের মতে ইয়াহূদীদের রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভ কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরিপন্থী। কুরআনের প্রতি আস্থাশীল হিসাবে তাঁদের এই দুশ্চিন্তা যে, খোদায়ী ঘোষণার বিপরীতে এমনটি হল কিভাবে এবং ইসরাইল রাষ্ট্রই বা কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল? এ সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় অধমকে মৌখিকভাবে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে; তেমনি উত্তর প্রেরণের তাগাদা সম্বলিত একাধিক চিঠিপত্রও অধমের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু আমার বুঝে আসছে না যে, এদের এই সংশয়ের মূল বুনিয়াদ কী ? কুরআনের সেই সুস্পষ্ট ঘোষণাটিই বা কোনটি যা এই সংশয়ের মূল ভিত্তি হতে পারে! আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি যতদূর জানি, তাতে কুরআনে কারীমে ইয়াহূদীদের রাষ্ট্র-ক্ষমতার ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন একটি ইশারাও এমন পাওয়া যায় না; যার দ্বারা এ জাতীয় সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। ইয়াহূদীরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না, এমন কোন ইঙ্গিত তো কুরআনে নেই, উপরন্তু তারা জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারবে না এমন কোন স্পষ্ট ঘোষণাও নেই।

### ইয়াহূদী জাতি সম্পর্কে আল কুরআনের একাধিক ঘোষণা

কুরআনে কারীমে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে মৌলিকভাবে তম্বিমূলক ও শাস্তিমূলক তিনটি ঘোষণা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে–

* এক. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লাঞ্ছনা।

* দুই. অবিরাম ও অব্যাহত অস্থিরতা।

* তিন. ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও যুক্তির ব্যাপারে স্থায়ী পরাজয় এবং ইলমে ইলাহী ও হিদায়াতে রব্বানী থেকে বঞ্চিত থাকা।

## প্রথম ঘোষণা : ذلت ও مسكنت লাঞ্ছনা ও আত্মগ্লানি

লাঞ্ছনা ও গ্লানি সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

"তাদের উপর অবধারিত করে দেওয়া হল পরোক্ষ লাঞ্ছনা ও প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা। আর তারা আল্লাহর রোষানলে নিপতিত হয়ে ঘুরতে থাকল।"

(সূরা বাক্বারা-৬১)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔

"অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হল। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা বাক্বারা-৯০)

এ থেকে এতটুকু স্পষ্ট হয় যে, ইয়াহুদী সম্প্রদায় বংশানুক্রমে অবাধ্যতা ও খোদাদ্রোহিতার কারণে আল্লাহর রোষানলে নিপতিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লাঞ্ছনার শাস্তি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

### জিল্লাত বা লাঞ্ছনা

প্রকৃত লাঞ্ছনা হল, আল্লাহর দৃষ্টি থেকে বান্দার পতন। একে অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লাঞ্ছনা বলা উচিত। আর প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা হল, মানুষের দৃষ্টি থেকে মানুষের পতন ও মান-মর্যাদাহীন হওয়া এবং সবার দৃষ্টিতে হীন বলে প্রতিভাত হওয়া। তদুপরি পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের অবস্থা এমন হওয়া যে, কেউ তার হাল হাক্বীকত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করবে না।

### মাস্‌কানাত বা আত্মগ্লানি

উপরোল্লেখিত অবস্থাদির স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, একটি অধপতিত জাতি যখন অন্য সবার কাছে সর্বদা মুখাপেক্ষী ও নীচ বলে গণ্য হতে থাকবে এবং তাদের কাছ থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবমাননা মিশ্রিত আচার-আচরণ পেতে থাকবে তখন সে জাতির মন-মানসিকতা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে

পড়বে এবং তারা হীনমন্যতায় ভোগতে শুরু করবে। এক পর্যায়ে নিজেরাই নিজেদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে গণ্য হবে। যাকে মূলত আত্মগ্লানি বলা হয়। আর এরই নাম মাস্‌কানাত।

অতএব, পার্থিব জিল্লতী বা লাঞ্ছনার পরিণাম হল, অন্যের দৃষ্টিতে নীচ ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়া; আর মাসকানাত বা আত্মগ্লানির পরিণাম হল, অন্যের বিদ্রূপ ও নিগ্রহের শিকার হয়ে নিজেই নিজের দৃষ্টিতে নীচ ও নগণ্য হয়ে যাওয়া।

বস্তুত এ সবকিছু অপ্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা থেকে উৎসারিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আর অপ্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা থেকে উদ্ভুত এসব প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা ক্ষণে ক্ষণে একের পর এক পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে।

এই লাঞ্ছনা ও আত্মগ্লানির কারণও স্বয়ং কুরআনে কারীম বর্ণনা করে দিয়েছে। এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা তাদের প্রতি কোন জাতির শত্রুতা, বিদ্বেষ কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহার পরিণাম নয়; বরং এটা তাদের নিজেদেরই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তিমিরসম পাপরাশির ফলশ্রুতি– যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মকাণ্ডের ফলাফল রূপে তাদের উপর আরোপ করেছেন মাত্র। যেমন, নিম্নে বর্ণিত আয়াতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

ذٰلِك بِانَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ويَقْتُلُوْن الْاَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلك بِما عصَوْا وّكانُوْا يَعْتدوْن.

“এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি-বিধান অস্বীকার করতো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। কারণ, তারা ছিল নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী।” (বাকারা-৬১)

আয়াতের সারমর্ম হল, সত্য বিধি-বিধান না মানা কিংবা সত্য থেকে বিমুখতা প্রদর্শন ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা এতো সকল কাফেরেরই চিরায়ত অভ্যাস ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা এর চেয়েও অগ্রসর হয়ে খুল্লাম খুল্লা প্রকাশ্যে হক্বের মোকাবেলা করেছে, ঐশী নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যে সব নবী তাদেরকে দুর্দিনে সুপথের দিশা দিয়েছিলেন– তাদেরকে হত্যা করেছে। পরবর্তীতে এ দুটো মারাত্মক অপরাধ থেকে জন্ম নিয়েছে হাজারো অপরাধ। যথা ঃ খোদাদ্রোহিতা, অবাধ্যচারিতা, স্থবিরতা ও আত্মম্ভরিতা,

অহংকার ও লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা, অবৈধ লেনদেন, ধোঁকাবাজি প্রতারণা, কপটতা, দুনিয়াপ্রীতি, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, ব্যাপক নৈতিক অধঃপতন ও অপকর্মে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি। যার বিস্তারিত বিবরণ গোটা সূরা বাক্বারা জুড়ে বিধৃত হয়েছে। এগুলোই হল তাদের ঐ সমস্ত গর্হিত-মন্দ অভ্যাস যেগুলোর কারণে আজ তারা লাঞ্ছনা ও আত্মগ্লানির শিকার। এগুলোর কারণেই খোদায়ী ক্রোধ আজ তাদের নিত্যসঙ্গী হয়েছে এবং লাঞ্ছনার শাস্তি তাদেরকে চতুর্পাশ থেকে বেষ্টন করে আছে।

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাদের এই লাঞ্ছনা মূলত চারিত্রিক ও আভ্যন্তরীণ। তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো এর লক্ষণাদি বাস্তবেও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। যেমন, পাপাচারী ফাসেক লোকেরা সাধারণত নিজেদের বদচরিত্র ও বদআমলের কারণে প্রথমত আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত হয়– যাকে জিল্লতে বাতেনী বা অপ্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা বলা হয়; তারপর মাখলুকের দৃষ্টিতেও নিন্দিত হয়– যার পরিণাম জিল্লতে জাহেরী বা প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা। অতএব, অপ্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার অর্থ হল, আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়া, আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং হিদায়াতের তাওফিক ও তওবা ইস্তিগফার-এর স্পৃহা অন্তর থেকে দূরীভূত হওয়া (আল ইয়াযু বিল্লাহ)। আর জিল্লতে জাহেরী বা প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার অর্থ হল, মানুষের নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়া, মানুষের কাছে কোন গুরুত্ব ও মান-সম্মান না থাকা। উপরন্তু হাল পুরসী তথা ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করার উপযুক্ত গণ্য না হওয়া।

*عزیزے کہ درگہش سربتافت + بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت*

"যে মুখ ফিরিয়েছে তব দরবার থেকে সে বিশ্ব-দরবারের কোথাও কোন ইজ্জত পাবে না।"

যেহেতু কুরআনে কারীমের ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ - আয়াতে জিল্লত তথা লাঞ্ছনাকে শর্তহীন সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; এ থেকে বুঝা যায় যে, ইয়াহুদীদের উপর উভয়বিদ লাঞ্ছনাই (প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ) আরোপ করা হয়েছে। অপ্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার কারণে তারা আল্লাহর দরবারে অগ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে এবং প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার কারণে তারা মানুষের দরবারে নীচ, হেয় ও মর্যাদাহীন হয়ে গেছে।

## ইয়াহুদীদের পরোক্ষ লাঞ্ছনার কুরআনী ব্যাখ্যা

আল্লাহর দরবারে ইয়াহুদীদের অগ্রহণযোগ্য হওয়ার উপর কুরআনে কারীমে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّاَيُؤْمِنُوْا بِهَا وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ.

"আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখব, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায়। যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখেও তবুও সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তা গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে তারা ছিল গাফেল"

(সূরা আ'রাফ-১৪৬)

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐশী নিদর্শনাবলী থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া এবং ঐশী হেদায়েত থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার পরিণাম এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, ঐশী করুণা ও তাওয়াজ্জুহ তাদের অভিমুখী হয়নি। আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, আল্লাহর দরগাহ থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে না দীনি বুঝ অবশিষ্ট আছে; আর না ধর্মীয় অর্ন্তদৃষ্টি বাকী আছে। বরং তাদের অন্তর বক্র ও কুঁজো হয়ে গেছে। ফলে ভালকে এখন মন্দ মনে হয় আর মন্দকে মনে হয় ভাল। এই বাস্তবতাকে কুরআনুল কারীম অন্যত্র 'লা'নাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে– যা ইয়াহুদীদেরই বক্র স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ.

" তারা (ইয়াহুদীরা) বলে আমাদের হৃদয়ের উপর পর্দা পড়ে গিয়েছে। না, বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।" (সূরা বাক্বারা-৮৮)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِم عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ.

"অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি (অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছি) এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার যথাস্থান থেকে বিচ্যুত করে ফেলেছে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে।" (সূরা মায়েদাহ-১৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

"ইতোপূর্বে তারা কাফেরদের উপর (মক্কার মুশরিকদের উপর) বিজয় কামনা করত। অবশেষে তাদের পূর্বজ্ঞাত বিষয়টি যখন তাদের কাছে পৌঁছল তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" (সূরা বাক্বারা-৮৯)

এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের উপর অভিসম্পাত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

"বনী ইসরাইলদের থেকে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে।"

(সূরা মায়েদাহ, আয়াত নং-৭৮)

এ তো স্পষ্ট কথা যে, লা'নাত এর অর্থই হল দূর করে দেয়া, তাড়িয়ে দেয়া, ধিক্কার জানানো। তাদের স্বীকারোক্তিমূলক বক্রতা, হৃদয়ের কাঠিন্য, আল্লাহর কালামে পরিবর্তন সাধন, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং জেনে বুঝে তা থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ও পলায়ন ইত্যাদি কারণে তাদের উপর এই লা'নাত বর্ষিত হয়েছে। আর এ কথাও স্পষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে ধিক্কার দিবেন তার ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহর মারেফত কখনই অর্জন হবে না।

ধর্মীয় পাণ্ডিত্য, দলীল প্রমাণে জ্ঞানগত বুৎপত্তি সে তো বহু দূরের কথা। বস্তুত এ পর্যায়টিই হল পরোক্ষ লাঞ্ছনার চূড়ান্ত পরিণতি! মোটকথা, আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং সেগুলোর বিশুদ্ধ জ্ঞান তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়াই হল জিল্লতে বাতেনী বা পরোক্ষ লাঞ্ছনা– যা আল্লাহর দরবার থেকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হওয়ার একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

## ইয়াহুদীদের প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার কুরআনী ব্যাখ্যা

এদিকে প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা সম্পর্কেও কুরআনুল কারীমে ঐ সমস্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যেগুলোর কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কাছে ইয়াহুদীরা অনবরত বেইজ্জতি, অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। বুখতে নছর তাদের উপর ভয়ংকর আক্রমণ করেনি কি? তার বাহিনী ইয়াহুদীদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে কতজনকেই না বেইজ্জত করেছে! কতজনকেই না অসিতলে নিপাত করেছে! কতজনকেই না বন্দী করে সাথে নিয়ে গিয়েছে! শেষতক সমস্ত কওমকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে রেখে গিয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلاً.

"অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার এমন কতিপয় বান্দাকে (অর্থাৎ বুখতে নছরকে) যারা ছিল প্রচণ্ড শক্তিধর। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।"

(সূরা বনী ইসরাইল–৫)

অবশ্য এরপর ইয়াহুদীরা নিজেদের অবস্থা গুছিয়ে শুধরিয়ে নেয়। কিন্তু শুধরানোর পর ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণের আধিক্য এবং পার্থিব জীবনের প্রাচুর্যতা তাদের মাঝে আবার পূর্বের ন্যায় আভ্যন্তরীণ কপটতা, পাপাচার ও সহজাত বদচরিত্রের জন্ম দেয় এবং নিজেদের সেই প্রাচীন অভিশাপের রথে তারা আবার চড়ে বসে। এ সময় টাইটিস রোমী তাদের উপর আক্রমণ করে। সে বুখতে নছরের জুলুম ও অত্যাচারকেও হার মানায়। বনী

ইসরাইলকে হত্যা করে, লুণ্ঠন করে, তাদেরকে বে-ইজ্জত করে, তাওরাতকে পাদুকাতলে পিষ্ট করে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে মল-মূত্র দিয়ে ভরে দেয় এবং সবাইকে আবারও গোলামী জীবনের বিপর্যয়ে ফাঁসিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.

"এরপর যখন দ্বিতীয় সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে (টাইটিস রোমীকে) প্রেরণ করলাম; যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে, যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই তারা জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।" (সূরা বনী-ইসরাইল, আয়াত-৭)

পরবর্তীকালে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন তারা এই ঐশীগ্রন্থটিকেও তাওরাতের মত অগ্রাহ্য করে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং শুধু অস্বীকারই নয়; বরং নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ এবং নবীদেরকে হত্যা করার পূর্ব স্বভাবগত অভ্যাসের কারণে তারা খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এরও মুখোমুখি হয়, গাদ্দারী করে, ষড়যন্ত্র করে মক্কার মুশরিকদেরকে মদীনায় আক্রমণ করার জন্য লেলিয়ে দেয়, হুজুর (সা.)কে হত্যা করার ফন্দি আঁটে, বিষ প্রয়োগ করে, তখন আল্লাহর নির্দেশে আবারও ইয়াহুদীরা লাঞ্ছিত হয়েছে। মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। অনেকে প্রাণ হারিয়েছে, অনেকের ধন-সম্পদ বিনাশ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পুনরায় সেই প্রতিশ্রুত লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে– যার সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত লাঞ্ছনা তথা পরোক্ষ লাঞ্ছনার সাথে প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনাও সর্বদা তাদের কণ্ঠহার হিসাবে ছিল। পৃথিবীর যে জনপদেই তারা বসবাস করেছে এই লাঞ্ছনা কখনো তাদের পিছু ছাড়েনি, তা এশিয়া হোক কিংবা ইউরোপ, আমেরিকা অথবা আফ্রিকা– যেখানেই তারা ছিল, কোন জাতি তাদেরকে নৈতিক মর্যাদায় মূল্যায়ন করেনি।

কুরআনুল কারীম তাদের উপর লাঞ্ছনার মোহর আঁটতে গিয়ে اينما ثقفوا এর মত শব্দও প্রয়োগ করেছে, যার অর্থ এছাড়া আর কি যে, তারা যেখানেই থাকুক এবং যে ভূ-খণ্ডেই থাকুক লাঞ্ছনা তাদের সাথে থাকবে এবং কোন জাতির অন্তরেই তাদের নৈতিক মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে না।

বস্তুত : প্রত্যক্ষ এই লাঞ্ছনার দৃশ্য যেমন তারা ফিলিস্তিন, বাবেল, রোম ও অন্যান্য শহরে দেখে এসেছে বর্তমানেও সেই দৃশ্য পূর্ববৎ রয়েছে। ইয়াহুদীদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান দুনিয়াতে এমনভাবে সর্বব্যাপিয়া বিস্তার লাভ করেছে যে, আজ শুধু মুসলমানরাই তাদেরকে ঘৃণিত মনে করে না; বরং পৃথিবীর অপরাপর জাতিগুলোও মুসলমানদের মত তাদেরকে নীচ ও হেয় জ্ঞান করে। আপনি হয়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলোতে দেখেছেন যে, যুদ্ধপূর্ব সময়ে ইয়াহুদীরা যখন জার্মানে বাস করত তখন বার্লিনের বিভিন্ন হোটেলের ঝুলন্ত বোর্ডে লেখা থাকত যে, "কুকুর এবং ইয়াহুদীদের এই হোটেলে প্রবেশ নিষেধ।"

জার্মানীরা ইয়াহুদীদেরকে 'পৃথিবীর রক্তচোষা জাতি' হিসাবে অভিহিত করেছে– যা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যপূর্ণ অভিধা। এ ব্যাপারে ইংল্যান্ডবাসীদেরও কোন দ্বিমত ছিল না। জার্মানীদের ওদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া কি তাদের কম অপমান লাঞ্ছনার প্রমাণ?

মুসলিম দেশসমূহের যেখানে যেখানে ইয়াহুদীদের বসতি ছিল, যদিও মুসলমানগণ তাদের উপর কোন বাড়াবাড়ি করেনি, অত্যাচার করেনি, কিন্তু তারপরও ইয়াহুদীদের সামাজিক অবস্থানকে তারাও পরিবর্তন করতে পারেনি। লাঞ্ছনার হাল তাদের সর্বাবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

'মানার' সম্পাদক আল্লামা রশীদ রেজা মিসরী কাজী বায়যাবী (রহ.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যার দ্বারা তদানীন্তন যুগে ইয়াহুদীদের সব দেশে বেইজ্জতী ও লাঞ্ছনার চিত্র ফুটে উঠেছে :

فاليهود صاغرون اذلاء السهل مسكنة ومدقعة إما على الحقيقة وإما لتضاعفهم وتفاقرهم خيفة ان تضاعف عليهم الجزية.

"ইয়াহুদীরা লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ছিন্নমূল এক সম্প্রদায়। এটা হয়ত সত্যিকার অর্থেই কিংবা লোক দেখানোর জন্য এরা নিজেদেরকে নিঃস্ব, দরিদ্র ও অসহায় হিসাবে জাহির করার কারণে, যাতে তাদের উপর জিযিয়ার পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে না যায়।"

উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা এই দাঁড়ায় যে, সত্যিকার অর্থে যতটুকু তাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছিল, এরা কৃত্রিমতা ও বানোয়াটির মাধ্যমে তাকে আরো বেশি করে দেখাত। যেন এই কৃত্রিম দারিদ্র্য ও নিঃস্বাবস্থার কারণে জিযিয়ার পরিমাণ কম ধার্য করা হয়।

কৃত্রিম এই লাঞ্ছনা ও দরিদ্রতা প্রদর্শন ছিল স্বয়ং এক ভিন্ন মাত্রার লাঞ্ছনার প্রতীক। কেননা, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন জাতিগুলো যদি কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে কোন প্রচেষ্টা চালায় তাহলে তা এজন্য চালায় যে, নিজেদের অসম্মান ও অমর্যাদাকে কিভাবে গোপন করে যতদূর সম্ভব নিজেদেরকে সম্মানীরূপে তুলে ধরা যায় এবং নিজেদের দুর্বলতাগুলো মানুষের সামনে প্রকাশ না পেয়ে যায়। এ তো ছিল তদানীন্তন যুগের ইয়াহুদীদের অবস্থা। বিজ্ঞ লেখক তার সমকালীন ইয়াহুদীদের অবস্থা লিখতে গিয়ে বলেন–

وهذا الوصف اكثر النطباقا عليهم فى اكثرالبلاد فى ذلك العصر.

"ইয়াহুদীদের এ অবস্থা (যা কাজী বায়যাবী (রহ.) বর্ণনা করেছেন) বর্তমান যুগেও অধিকাংশ দেশে অপরিবর্তিত রয়েছে।"

(আল মানার- পৃ. ৬৯ খণ্ড-৪)

এ থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এশিয়া, ইউরোপ কিংবা অন্য যে কোন মহাদেশের ইয়াহুদী হোক তাদের লাঞ্ছনা, অবমাননা পৃথিবীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জাতির কাছেই ছিল এক চেনা-জানা প্রসিদ্ধ সুবিদিত বিষয়। এমনকি খৃষ্টান জগত পর্যন্ত তাদেরকে নীচ ও হেয় জ্ঞান করত।

যেখানে হিটলার তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে; সেখানে বৃটেন ও আমেরিকা তাদের নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মুসলমানদের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করে ইয়াহুদীদের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদেরকে

ইসরাইল অভিধায় অভিহিত করেছে। যাতে আরবদের শক্তি-দর্প চূর্ণ হয়। অথচ ইতোপূর্বে কেউ জানতই না যে, ইয়াহুদীরা পৃথিবীর কোন জীবিত না মৃত জাতি কিংবা ইসরাইল বলতে কি বুঝায়?

## ইসরাঈলের প্রতি ইউরোপিয়ানদের প্রতারণাময় সহানুভূতি

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার বনহুর্ড ইসরাঈলের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অত্যন্ত সহানুভূতি ও দরদী ভঙ্গিতে বলেছিলেন যে, "আখের এই ছন্নছাড়া জাতির (ইয়াহুদী) জন্যেও পৃথিবীতে কোন দেশ থাকা উচিত।"

এ মন্তব্য তো স্বয়ং তাদের অপমান ও লাঞ্ছনার এক স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এবং প্রকাশ্য ঘোষণা

কিন্তু এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যে, ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অন্তরে এত অনীহা ও ঘৃণা পোষণ করা সত্ত্বেও এটাই যদি ছিল তাদের প্রতি ইউরোপিয়ানদের সহমর্মিতা, তাহলে ইউরোপের কোন এক অঞ্চলে কেন তাদের বসতি স্থাপন করতে দেয়া হয়নি? অথচ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখনো অনেক জনমানবহীন অনাবাদী অঞ্চল পড়ে আছে যেগুলোকে তারা নিজেরাও মানববসতি দিয়ে আবাদ করে তুলতে চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরবদের দেশ টুকরো টুকরো করে ইউরোপ থেকে শত সহস্র মাইল দূরে ফিলিস্তিনে তাদের বসতি স্থাপন করতে দেয়া হয়েছে; তথাপি তারা ইয়াহুদীদেরকে আপন জ্ঞাতি ভাই মনে করে ইউরোপের কোন অঞ্চলে সমমর্যাদা দিয়ে বসতি স্থাপন করতে দেয়নি।

এর কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, ইউরোপিয়ানদের কাছেও এই জঘন্য দুরাচারী সম্প্রদায়ের এতটুকু গ্রহণযোগ্যতা ছিল না যে, তাদেরকে ইউরোপের কোথাও স্থান দিয়ে তাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার অবসান ঘটিয়ে এই বোঝা নিজ মাথায় বহন করা যায়। বরং তারা এটাই সমীচীন মনে করেছে যে, নিজেদের দেশকে এই জাতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং পবিত্র রাখার জন্য উপরন্তু ইউরোপীয় ইয়াহুদীদেরকেও এশিয়ায় পুশইন করার জন্য এদেরকে পশ্চিম এশিয়ায় ঠেলে দেয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে করে "এক ঢিলে দুই পাখি" শিকারের নীতিতে একদিকে তাদের সাথে প্রকাশ্য

সহানুভূতিও বহাল থাকে; অপরদিকে আরবরা মাতৃভূমি হারানোর বিপদ, বেদনার শিকার হয়ে অনায়েসে ইউরোপের অনুগত ফরমাবরদার হতে বাধ্য হয় এবং তাদের ঐক্য যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ও ভবিষ্যতে কোনদিন যেন তারা ইউরোপের প্রতি সরাসরি চোখ তুলে তাকানোর সাহস না পায়।

কেন, এ থেকে কি এটা মনে করা যেতে পারে না যে, ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের বসতি স্থাপন করে দেয়া বস্তুত তাদেরকে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মনে করারই পরিণাম! যাতে এক গুলিতে দুই পাখি শিকার হয়ে যায়। একদিকে ইউরোপ থেকে এই লাঞ্ছনা ও অবমাননার আপদ বিদায় হয়ে যায়, অপর দিকে আরবদের শক্তিও ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ইয়াহুদীদের সাথে কৃত্রিম সহানুভূতির প্রদর্শনীও হয়ে যায়। আহ! ভয়ংকর ত্রয়ীর কি চমৎকার মেলবন্দন!

## ইয়াহুদীদের সর্বকালে স্থায়ী লাঞ্ছনার প্রকৃত কারণ

ইয়াহুদীদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা সভ্য ও সচেতন পৃথিবীর নিকট এক সর্বস্বীকৃত বিষয় হিসাবে পরিগণিত। যখন থেকে কুরআনুল কারীম তাদের উপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার মোহর এঁটে দিয়েছে তখন থেকেই সমগ্র পৃথিবী তাদেরকে নীচ ও হেয় মনে করতে শুরু করেছে। যে মুহূর্ত আল্লাহর দৃষ্টি থেকে তাদের পতন ঘটেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই পৃথিবীর সকল জাতির দৃষ্টি থেকে তাদের পতন ঘটা শুরু হয়েছে। যার দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এ জাতির এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা মানুষের পক্ষ থেকে তাদের উপর আরোপ করা হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত হয়েছে। কেননা, যে লাঞ্ছনা মানুষকে মানুষের পক্ষ থেকে দেয়া হয় তা সাধারণত এত ব্যাপক ও স্থায়ী হতে পারে না যে, দুনিয়ার প্রতিটি সচেতন জাতি এর কারণে প্রভাবিত হবে। যদি ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা কোন জাতির শত্রুতা কিংবা ঘৃণামিশ্রিত পদক্ষেপ অথবা কোন জাতির শৌর্য-বীর্য ও শক্তি প্রয়োগের ফলাফল হত তাহলে অবশ্যই তা হত (মাকামী) স্থানীয় ও সাময়িক; এত ব্যাপক ও স্থায়ী কিছুতেই হত না এবং এর উপর أَيْنَمَا ثُقِفُوا (যেখানেই থাক লাঞ্ছিতই হবে) এর ছাপ লাগার কথা ছিল না। কেননা, কোন লাঞ্ছিত জাতি যে দেশে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে, যদি সে দেশ

থেকে হিজরত করে অন্য কোন দেশে চলে যায় তাহলে নিশ্চিত সে জাতির লাঞ্ছনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তারা এই নতুন দেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের হৃত সম্মানকে পুনরুদ্ধার করে নেয়।

আর যদি কোন পরাশক্তির চাপ কিংবা প্রভাবের কারণে কোন জাতির সাথে ঘৃণামিশ্রিত বিমাতাসূলভ আচরণ করা হয়, তাহলে যখন সেই শক্তির চাপ খতম হয়ে যাবে (যা এই পরিবর্তনশীল ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অহরহ হচ্ছে) তখন সেই লাঞ্ছনা ও ঘৃণাও খতম হয়ে যাবে।

এই ইয়াহুদীদেরকে ফেরাউন নানাভাবে অপমান অপদস্ত করেনি কি? নানাভাবে সে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। কিন্তু ফেরাউন এবং তার দাপট; ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটে আর তারা তাদের হৃত ইজ্জত ও গৌরব আবার ফিরে পায়। পরবর্তীতে বুখতে নছর বনী-ইসরাইলকে কি কিছু কম অপমান অপদস্ত করেছে? এক পর্যায়ে তাদের মূলোৎপাটন করে ফেলার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু বুখতে নছরের তিরোহিত হওয়ার পর এই কঠিন কালেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তারপর বনী-ইসরাইল আবারও নিজেদের উত্থান প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে ও ক্ষমতার আসনে পুনঃ অধিষ্ঠিত হয়।

মোদ্দাকথা, পৃথিবীর কারো পক্ষ থেকে আরোপকৃত কোন লাঞ্ছনা ও ঘৃণাই সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয় না। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোন জাতির উপর শ্যেন দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে তাদের পরিত্রাণ দাতা আল্লাহ ব্যতীত কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে পারে না। আর তা সাময়িক ও স্থানীয় হয় না; বরং তা সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী রূপ লাভ করে। বিশেষত যখন সেই প্রকৃত অপদস্তকারী (আল্লাহ) স্বয়ং নিজেই ঘোষণা করে দেন যে, اَيۡنَمَا ثُقِفُوۡٓا (ইয়াহুদীরা যেখানেই থাকুক না কেন লাঞ্ছিত হবেই)। তদুপরি এই লাঞ্ছনাকে তিনি ضَرْب শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে টাকশালে মুদ্রার উপর মোহরের ضَرْب (ছাপ) লাগিয়ে মুদ্রার গাত্রে এর নকশা উৎকীর্ণ করে দেয়া হয়– যা মুদ্রার অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না; তেমনি ইয়াহুদীদের উপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার মোহর মেরে এর নকশা তাদের সত্ত্বায় উৎকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে– যা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের থেকে খোদায়ী চিকিৎসা ছাড়া বিচ্ছিন্ন হবে না। এজন্য এই লাঞ্ছনা কোন স্থানে এবং কোন কালে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং গোটা বিশ্বের সকল জাতির

অন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি যারা প্রকাশ্যে ইয়াহুদীদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে তারাও এ লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

সুতরাং ইয়াহুদীদের এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় কারো মদদ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্তার লাভ করেছে– যা ঐশী ঘোষণা ও খোদায়ী ক্রোধের নতীজা বা ফলশ্রুতি এবং যা অদ্যাবধি অনুভূত ও গোচরীভূত হচ্ছে।

বস্তুত এহেন লাঞ্ছিত, অপমানিত, অসহায় ও ঐশী কোপানলে নিপতিত জাতি স্বভাবতই আত্মিক প্রশান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে না। কারণ, নিজেদের আভ্যন্তরীণ অনিষ্টতা এবং বাইরের ক্রমাগত অপমান অপদস্ততা এবং সীমাহীন অযত্ন ও গুরুত্বহীনতার কারণে সে জাতির আত্মিক মৃত্যু ঘটে। ফলে তারা নৈরাশ্যের অর্ন্তমুখী যাতনা, ব্যাকুলতা ও অস্থিরচিত্ততার কারণে কোন সময়েই শান্তি ও স্বস্তিতে শ্বাস নিতে পারে না। যেমনটি সাধারণত অপরাধপ্রবণ জাতির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাদের অন্তর সর্বদা অশান্তি ও অস্থিরতার আখড়া হয়ে থাকে। ইয়াহুদীদের মত এমন এক অপরাধপ্রবণ জাতির পরিণতি এমনিতর না হওয়া ছিল অসম্ভব। তাছাড়া এমনতর জাতিসমূহের পার্শ্ব পরিবেশও তাদেরকে উৎপীড়ন না করে রেহাই দেয় না। যেমন– আমরা চিরাচরিত প্রথা এবং আল্লাহর অলংঘনীয় অমোঘ বিধানরূপে লক্ষ্য করে আসছি।

স্বয়ং কুরআনুল কারীম তাদের অন্যকর্তৃক উৎপীড়িত হওয়ার স্বরূপ সম্পর্কে– যা মূলত তাদের নৈতিক অধঃপতনের ফলশ্রুতি, স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে :

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ.

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছিলেন যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এমন সম্প্রদায়কে তাদের বিরুদ্ধে উত্থিত করবেন, যারা তাদেরকে জঘন্য শাস্তি আস্বাদন করাবে।

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এ জাতিকে কখনো নিরাপদ ও শান্তিতে বসতে দিবেন না এবং কিয়ামত অব্দি তাদেরকে শাস্তি

প্রদান ও বিপদে ফেলার জন্য সময়ে সময়ে এমন সব লোকের উত্থান ঘটাতে থাকবেন যারা অনবরত তাদেরকে লাঞ্ছনাকর পন্থায় অস্থিরচিত্ত এবং অশান্ত করে রাখবে। এরই পাশাপাশি তারা নিজেদের ভিতরগত হীনতাকে অনুভব করে মানসিক যাতনা ও যন্ত্রণা থেকে কখনোই মুক্ত হতে পারবে না। এর প্রকৃত কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এ জাতি নবীদের প্রাণে বধ করা, রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ন্যায় জঘন্য পথ ধরে সর্বদা নবীদেরকে এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদেরকে প্রতি যুগে অশান্ত করে রাখত, নির্যাতন করত এবং নবীদের জীবদ্দশায় তাদের ব্যাপারে নানা ধরনের সংকট সৃষ্টি করত এবং উৎপীড়নের উপাদান ও সামগ্রী সরবরাহ করত। অতএব এহেন জাতি নিজেরা কি করে শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে পারে? আর শান্তি আসবেই বা কোত্থেকে? যেখানে শান্তি ও মানসিক সুখের রহস্য আল্লাহর যিকির ও যিকিরওয়ালাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার মাঝে নিহিত– যাকে কখনোই এ জাতি আমলে আনেনি।

* مَنْ لَّا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ "যে রহম করে না সে রহম পায় না।"

* مَنْ ضَحِكَ ضُحِكَ "যে হাসে সে হাস্যস্পদ হয়।"

* مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِاَخِيْهِ فَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ "যে অন্যের জন্য কূপ খনন করে সে নিজেই তাতে পতিত হয়।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই ইয়াহুদীদের কারণেই বায়তুল মুকাদ্দাস সর্বদা সংকট ও বিপর্যয়ের মুখে ছিল, আজও আছে।

শতবার বনী ইসরাইল সংগঠিত হয়েছে আবার ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের ক্ষেত্রে উপরওয়ালার পক্ষ থেকে এমনটিই হয়ে আসছে যে, কেউ না কেউ তাদের উপর জবরদস্তি চেপে বসেছে, নির্যাতন ও নিপীড়নের দ্বারা তাদেরকে অশান্ত করে তুলেছে এবং ভবিষ্যতেও তাদের এমনটিই হবে।

একথা বলা যেতে পারে যে, এই সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ শুধুমাত্র ইয়াকুব পরিবারের (বনী ইসরাইল) ক্ষেত্রে হওয়া উচিত, সাধারণ ইয়াহুদীদের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্ন জাতি থেকে এসে ইয়াহুদীদের ধর্মমতের অধিভুক্ত হয়েছে তাদের বেলায় এরূপটি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাস্তব হল এই যে, ঐশী কোপানলে পতিত জাতির সংশ্লিষ্টরাও কোপানলে নিপতিত হয়ে থাকে।

তাছাড়া এই বিভাজনও অত্যন্ত জটিল যে, কে বনী ইসরাঈলের আর কে ইয়াহুদী বংশের? আর এজন্যই হুকুমের দিক থেকেও ইয়াহুদী ও বনী ইসরাইল এর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা বড়ই কঠিন।

## ইয়াহুদীদের উপর ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআনের তৃতীয় দাবী এই যে, ইয়াহুদী সম্প্রদায় ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও প্রকৃত ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। নিজেদের অব্যাহত অপচিন্তা ও অনিষ্টকর ধ্যান-ধারণার কারণে তাদের অন্তর এবং স্বভাব প্রকৃতি এতটুকু বিকৃত হয়ে গেছে যে, সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই জাতীয়ভাবে তাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। যার দরুন তারা ধর্মীয় দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর কখনই প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না। বরং তারা সর্বদা পরাজিত ও নীচু থাকবে। আর তাদের থেকে প্রকৃত ইলম ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিলুপ্তি নিঃসন্দেহে তাদের পরোক্ষ লাঞ্ছনার চূড়ান্ত পরিণতি।

কুরআনুল কারীমের ইরশাদ অনুসারে আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহ (আ.)কে সম্বোধন করে চারটি ওয়াদা করেছিলেন। তন্মধ্যে চতুর্থ ওয়াদাটি ছিল এই :

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যারা তোমার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর তোমার প্রতি বিশ্বাসীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রেখো।"

কুরআনুল কারীমের এই দাবীর উদ্দেশ্য হল যে, ধর্মীয় দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের চেয়ে ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা শ্রেষ্ঠ, বিজয়ী ও প্রবল থাকবে। যেমন اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (কিয়ামত পর্যন্ত) কথাটি এর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, এখানে শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বকেই বুঝানো হয়েছে, বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। কারণ, বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব এক ভ্রাম্যমান ছায়ার ন্যায় মাত্র; যা কোন জাতির উপর অতীতেও সর্বদা বিদ্যমান ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। স্বয়ং বস্তুর মাঝেই যখন রূপান্তর ঘটে তখন তার অনুষদ ও অনুসঙ্গগুলোর স্থিরতা ও স্থায়িত্ব কতটুকুই বা থাকতে পারে?

বস্তুত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন এমন এক বাস্তব বিষয় যা শুধু অন্তরেই নয়, বরং খোলা চোখেও সর্বদা প্রত্যক্ষ করা যায়। কুরআনুল কারীমও বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের উত্থানের স্থায়িত্বহীনতাকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তবে কুরআনুল কারীম যে বিষয়ের স্থায়িত্বকে স্বীকার করেছে তা হল একমাত্র হক্ব ও সত্য এবং তার দলীল প্রমাণ। শুভ পরিণতি সর্বদা এ দু-য়েরই অনুকূল হয়ে থাকে। যেহেতু এখানে ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠত্বের ও বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে; সেজন্য সাধারণ অবস্থায় হক ও সত্য এবং তার দলীল প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্বকে বুঝানোই কেবল উদ্দেশ্য হতে পারে; যা অতীত থেকে চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। মুফাসসিরীনদের মধ্যে কাতাদা, হাসান বসরী, ইবনে জুরায়েজ প্রমুখ মনীষীদের থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে। রুহুল মা'আনীতে তাদের মতামতগুলো দেখা যেতে পারে।

## ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী কারা ?

এখন ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের নিয়ে আলোচনা করা যাক। একথা স্পষ্ট যে, দুটি মাত্র জাতিই কেবল ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হতে পারে। ১. খৃষ্টান জাতি। ২. মুসলিম জাতি। খাতামুন নাবিয়্যীন (সা.) প্রেরিত হওয়ার পূর্বে খৃষ্টানরাই ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর একমাত্র অনুসারী। তবে খৃষ্টান জগতও ইঞ্জিল শরীফে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কারণে ইয়াহুদীদের মত তারাও সত্য ও সততা এবং সত্যাশ্রিত দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের যোগ্যতাকে নিজের হাতে খুইয়ে ফেলেছে। এহেন হাল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদের যৌক্তিক বিজয় তথা দলীল প্রমাণের মাধ্যমে বিজয়ের কোন প্রশ্নই আসে না। যেমনটি কুরআনুল কারীম দাবী করেছে :

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ

"যারা বলে, আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর যে উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করার কথা তারা ভুলে গেল।" (সূরা মায়েদাহ-১৪)

কিন্তু তারপরও সত্য তাদের থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। যেমন– যামানায়ে ফাতরাত তথা ওয়াহীর বাণীশূন্য কাল সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল

(সা.)-এর বক্তব্য অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিল। তিনি বলেন যে, যখন তাঁর প্রেরিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সমস্ত জাতির প্রতি প্রতাপপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন যে, আহলে কিতাবের গুটিকতক লোক ছাড়া আর কোথাও হকের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। বন্ধু-বান্ধবহীন কতিপয় আহলে কিতাব নিজেদের ঘাটিতে, গুহাতে এবং গহীন অরণ্যে লুকিয়ে-ছাপিয়ে পড়ে আছে। অর্থাৎ তাদের হাতে না ছিল দুনিয়ার কোন সামান-পাথেয়, আর না ছিল তাদের কথা শুনবার মত কোন লোক। শুধুমাত্র হক ও দীনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ– যা এই চরম মুহূর্তেও তাদের হাতছাড়া হয়নি। এজন্য প্রকৃত অর্থে এরাই ছিল ঈসা (আ.)-এর অনুসারী– যারা নিঃসন্দেহে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ইয়াহুদী ও সমকালীন বিপথগামী খৃষ্টানদের উপর ছিল বিজয়ী। কিন্তু তাদের কথা শুনবার মত কেউ ছিল না। আর তাই এঁরা নিজেদেরকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে হিজরতের পথ ধরে একাকিত্বকে বেছে নিয়েছিল। যেমনটি বেছে নিয়েছিলেন সমস্ত আম্বিয়া কিরাম। অর্থাৎ তাঁদের কওমে যদি তাঁদের কথা শুনবার মত কেউ না থাকত এবং কওম শাস্তি ও ধ্বংসের কিনারায় এসে উপনীত হত তখন তারা খোদার পক্ষ থেকে হয়ত জিহাদের নির্দেশ পেতেন কিংবা হিজরতের– যা তাদের দীনি অবিচলতা, দলীল প্রমাণের বস্তুনিষ্ঠতা ও বিজয় হিসাবে পরিগণিত হত।

এই উম্মাতে মরহুমার হকপন্থীদেরকেও সেই একই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ "যখন বাতিল পন্থীদের উত্থান ঘটবে, চতুর্দিকে তাদের জয় জয়কার হবে এবং বাতিলের উত্থানে হক পর্দার অন্তরালে ঢাকা পড়বে, হকের কথা শুনবার মত কেউ থাকবে না, সশস্ত্র জিহাদের শক্তি থাকবে না কিংবা পরিবেশ থাকবে না তখন তোমরা নিজেদের দীন রক্ষার স্বার্থে কেবল নিজেদেরকেই সামলে নাও- যাতে বাতিলপন্থীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে।"

অনুরূপভাবে খৃষ্টানদের মাঝেও কতিপয় হকপন্থী ছিলেন। এজন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, তখন পর্যন্ত খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের থেকে হক চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সে কারণে দলীল প্রমাণহীন ইয়াহুদীদের উপর খৃষ্টানদের যৌক্তিক বিজয় অক্ষুণ্ন ছিল। যদিও পার্থিব শক্তি সামর্থ সে সকল হকপন্থীদের করায়ত্ত ছিল না।

নবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পর এ সকল হকপন্থীই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং ইসলাম আসার পর খৃষ্টধর্মের দাবীদার খৃষ্টান জগৎ সর্বোতভাবে হক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এজন্য বর্তমানে ঈসা (আ.)-এর অনুসারী কেবল মুসলমানরাই হতে পারে– যারা প্রকৃত অর্থেই হযরত মাসীহ (আ.)-এর অনুসারী। কেননা, মুসলমানরাই তাঁর পয়গাম্বরসূলভ বড়ত্ব ও মহত্ত্বের একমাত্র প্রবক্তা ও বিশ্বাসী। মুসলমানরাই তাঁকে উলুল আজম ও জলীলুল কদর নবী হিসাবে জানে এবং তাঁর 'কালিমাতুল্লাহ' 'রুহুল্লাহ' ও 'আব্দুল্লাহ' হওয়ার উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। মুসলমানরা ঈসা (আ.)-এর মহত্ত্বের প্রেমিকই শুধু নয়; বরং আল কুরআনের স্বীকৃতির কারণে তাঁর আনীত শরীয়তের সত্যতারও স্বীকৃতিদাতা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী। সুতরাং অন্য নবীদের শরীয়তকে যেমন মুসলমানরা আল-কুরআনের স্বীকৃতির কারণে জানে ও মানে, (তবে এটা ভিন্ন কথা যে, বর্তমানে সে সকল শরীয়তের উপর আমলের বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে) তেমনিভাবে আল-কুরআনের মধ্যস্থতায় তারা ঈসায়ী শরীয়তকেও তদানীন্তন সময়ের সত্য শরীয়ত হিসাবেই জানে এবং বিশ্বাসগত দিক থেকেও একে মানে। এজন্যই কুরআনকে مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তের সত্যায়নকারী। এর অর্থই হল শরয়ীভাবে মানা এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আস্থাশীল হওয়া। এজন্য প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ.)-এর অনুসারী বর্তমানে মুসলমানদের ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন জাতি নেই এবং হতেও পারে না।

## বর্তমান খৃষ্টানরা ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী নয়

বর্তমান খৃষ্টান জগত যারা নিজেদেরকে ঈসায়ী বলে পরিচয় দেয় এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবী করে, প্রকৃত অর্থে তারা না ঈসা (আ.)-এর অনুসারী, আর না তারা 'অনুসারী' অভিধায় অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত। বড়জোর তাদেরকে শুধুমাত্র জাতিগতভাবে 'অনুসারী' বলা যেতে পারে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কেননা, তারা ঈসায়ী শরীয়তকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বিকৃতি সাধন করতে নিছক জাতিগত পরিচয় হিসাবে এটাকে নিজেদের উপর চাপিয়ে রেখেছে। তারা

এই বিকৃত শরীয়তের আলোকে হযরত ঈসা (আ.)কে 'আল্লাহর বান্দার' স্থলে 'আল্লাহর পুত্র' এবং তিন খোদার এক খোদা হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত তাওহীদকে বিতাড়িত করে তদস্থলে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যে 'আবদিয়্যত' (আল্লাহর বান্দা হওয়া)-এর ঘোষণা তিনি মাতৃক্রোড়েই দিয়েছিলেন, সেই 'আবদিয়্যত'কে উলুহিয়্যত তথা ঈশ্বরত্বের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে এবং তাঁকে দেহধারী ইশ্বর সাব্যস্ত করেছে। তাঁর পূত পবিত্র ও খালেছ জান্নাতী ব্যক্তিত্বকে কাফ্ফারাস্বরূপ তিন দিনের জন্য জাহান্নামী সাব্যস্ত করেছে (আল্লাহর পানাহ)। তার আনীত কিতাব (ইঞ্জিল শরীফ)কে বিকৃতির পর বিকৃত করে মূল্যহীন করে দিয়েছে। তারপরও যা ছিল তারও কোন সনদ নেই বরং মূল কিতাবেরই কোন অস্তিত্ব নেই। কয়েকটি অনুবাদ আছে মাত্র, তাও আবার পরস্পর বিরোধী ও সংঘাতপূর্ণ।

এটা স্পষ্ট যে, ঈসায়ী ধর্মে এ সকল নিজস্ব মতামতের অন্তর্ভুক্তি এবং নানা রকমের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পর আজকের মৌলিকত্বহীন ইঞ্জিলের অনুসরণ এবং হযরত মাসীহ (আ.)-এর মূল ব্যক্তিত্বকে মিটিয়ে উপরোক্ত গুণাগুণ বিশিষ্ট অপ্রকৃত কাল্পনিক ব্যক্তিত্বের অনুসরণকে ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসরণ বলা যেতে পারে কি? কখনো নয়। একমাত্র মুসলমানরাই আছে যারা আল-কুরআনের সূত্রে তাকে প্রকৃত মাসীহ (আ.) এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মূল ইঞ্জিলের উপর ঈমান আনয়নের কারণে প্রকৃত অর্থে 'ঈসা (আ.)–এর অনুসারী' হওয়ার উপযুক্ত।

## প্রকৃত অর্থে ঈসা (আ.)-এর অনুসারী শুধুমাত্র মুসলমানরাই

মোদ্দাকথা, ঈসা (আ.)-এর অনুসারী স্ব স্ব আঙ্গিকে কেবলমাত্র দুটি সম্প্রদায়। প্রাক-ইসলামী যুগে খৃষ্টান জাতি, আর ইসলাম-পরবর্তী যুগে মুসলমান জাতি। বাস্তব সত্য হল যে, আল-কুরআন সাধারণভাবে দাবী করেছে যে, ইয়াহুদীদের উপর দলীল ও প্রমাণের ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীগণ বিজয়ী থাকবে। আর ইয়াহুদীরা সর্বদা তাদের কাছে পরাজিত থাকবে। এজন্য এই আয়াত থেকে দলীল প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াহুদীদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই দুই জাতিরই অর্জিত রয়েছে– যা কোথাও কোথাও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের রূপও লাভ করেছে।

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা আল-কুরআনের উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম সংক্রান্ত দলীল ভিত্তিক প্রাধান্য/শ্রেষ্ঠত্ব। তবে রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে কুরআন অস্বীকার করেনি। অতএব, যদি কোন সময় তাদের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বও অর্জিত হয়ে যায় তাহলে তা কুরআনের খেলাফ হবে না।

মোদ্দাকথা, ইয়াহুদীদের ক্রোধের পাত্র হওয়া সম্পর্কে কুরআন স্পষ্ট করে যা কিছু বলেছে তা মৌলিকভাবে এই তিনটিই।

১. তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননার মোহর এবং এর কার্যকারণ ও পরিণতি। কার্যকারণ বলতে তাদের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড এবং পরিণতি বলতে তাদের দুরাবস্থা ও হীনমন্যতাকে বুঝানো হয়েছে।

২. খোদার সৃষ্টির হাতে তাদের অব্যাহত নিপীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের শিকার হওয়া যা থেকে কখনো তাদের অব্যাহতি নসীব হয়নি এবং কখনোই তাদের মানসিক প্রশান্তি মিলেনি।

৩. ধর্মীয় দলীল প্রমাণের ক্ষেত্রে তাদের অধঃপতন ও পরাজয়। অন্য কথায় সহীহ জ্ঞান ও হিদায়াত থেকে বিচ্যুতি এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহীহ জ্ঞান ও ঐশী হিদায়াতের আলোকে দলীল প্রমাণের ক্ষেত্রে তাদের উপর বিজয়ী থাকা।

ইয়াহুদীদের রাষ্ট্র ক্ষমতার ব্যাপারে আল-কুরআন ইতিবাচক নেতিবাচক কোন মন্তব্যই করেনি।

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের মাঝে ইয়াহুদীদের দৌলত ও সম্পদের কথা যেমন উল্লেখ নেই তেমনি রাষ্ট্র ক্ষমতারও কোন উল্লেখ নেই। কুরআন এ ব্যাপারে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোন মন্তব্যই করেনি। অতএব ইয়াহুদীদের উপরোক্ত তিনটি নিন্দনীয় অবস্থা তথা লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা ও যুক্তি-প্রমাণের ক্ষেত্রে পরাজয় ইত্যাদি থেকে ইয়াহুদীদের দৌলত, সম্পদ ও রাষ্ট্র ক্ষমতার ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য সৃষ্টি করা কুরআনের উপর নিজ থেকে বানোয়াট একটি বিষয় বর্ধিত করার নামান্তর। অথচ কুরআন এ ব্যাপারে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোন স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেনি।

এমন একটি মনগড়া মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে তাদের সম্পদ এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে রায় দেওয়া আপন মনগড়া মতের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে আলোচনার প্রয়াস পাওয়া মাত্র। কুরআনের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এর পরিষ্কার অর্থ হল, কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি তাদের পার্থিব ধন-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে অর্জিত হয় এবং কোন প্রচলিত রাষ্ট্র ক্ষমতাও যদি তাদের হস্তগত হয়ে যায় তাহলেও তা কুরআনে বর্ণিত লাঞ্ছনার পরিপন্থি হবে না। কেননা, লাঞ্ছনা ও অবমাননার অর্থ সম্বলহীনতা ও দরিদ্রতা নয়; বরং এর অর্থ হল আল্লাহ কিংবা মানুষের চোখে মান-মর্যাদাহীন হওয়া। যার মূল কারণ লাঞ্ছিত সম্প্রদায়ের নৈতিক অবক্ষয় ও অশালীন কর্মকাণ্ড, সম্পদ থাকা না থাকা এর কারণ নয়।

একটি জাতি যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েও নিজেদের অসভ্য কার্যকলাপের দরুন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নীচ ও হেয় হতে পারে এবং নানা ধরনের কষ্টের শিকার হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে অজস্র কোটিপতি রয়েছে। কিন্তু তারা যদি অসভ্য ও অসৎ হয় এবং সম্পদের নেশায় মাতাল হয়ে বিলাসিতা, অশ্লীলতা, লাম্পট্য, হত্যা ও ছলচাতুরির আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের ধন-সম্পদ পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে তাদের নীচতা ও হেয়তাকে আড়াল করতে পারবে না; বরং তারা বিত্তশালী হওয়ার পরও নীচ ও হেয় থেকে যাবে। বাস্তবে তারা যত বড় পুঁজিপতিই হউক না কেন। যদি তাই না হত তাহলে আজ ধনী শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে শ্রেণী সংগ্রাম–এর উদ্ভব হত না এবং পৃথিবীর বড় বড় পুঁজিপতিদেরকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মনে করা হত না।

এজন্য বর্তমান ইয়াহুদীদের অজস্র সম্পদ আছে একথা যদি মেনেও নেয়া হয়- দীর্ঘদিন যাবত যার ঢোল পিটানো হচ্ছে এবং যার উপাখ্যান মানুষের মুখে মুখে চর্চিত হচ্ছে; তবুও এটা তাদের আল্লাহর নিকট কিংবা মানুষের নিকট সম্মানী হওয়ার দলীল নয়, আর না এটা তাদের মোহরকৃত লাঞ্ছনার পরিপন্থী। কেননা, ধন-সম্পদ কোন যোগ্যতার মাপকাঠি নয়, আর না এটা গ্রহণযোগ্যতার কোন সনদ বলে গণ্য হয়।

তারপরও বাস্তবতার প্রতি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ইয়াহুদীদের ধন-সম্পদের উপাখ্যান কল্পিত উপাখ্যানের চেয়ে বেশি কিছু

নয়। তাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নিঃসন্দেহে লাখপতি, কোটিপতি রয়েছে। কিন্তু জাতি হিসাবে ইয়াহুদীরা নিঃস্ব ও দরিদ্র জাতি, যাদেরকে গুটি কতক পুঁজিপতির কারণে ধনী মনে করা যেতে পারে না।

বাস্তবতা হল, বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ইয়াহুদীরা জাতি হিসাবে অত্যন্ত নিঃস্ব ও দরিদ্র একটি জাতি- যাদের উপর লাঞ্ছনার পাশাপাশি নিঃস্বতাও আরোপিত রয়েছে। ইনসাইক্লোপেডিয়ার নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পড়ে দেখুন, যা মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) অনুবাদ রূপে উদ্ধৃত করেছেন। এতে ইয়াহুদীদের সম্পদশালী হওয়ার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'সাধারণ ইয়াহুদীরা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক বেশি গরীব। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, তাদের কতক আবার অনেক সম্পদশালী।' (জিউস, ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৬১)

অতঃপর পূর্বোক্ত কিতাবের এই অনুবাদটুকুও খেয়াল করুন, 'ইয়াহুদীদের সম্পদশালী হওয়া প্রবাদসীমা পর্যন্ত প্রসিদ্ধি পেয়েছে বটে; কিন্ত বিশ্লেষকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইউরোপের যে সমস্ত রাষ্ট্রে ইয়াহুদী বসতি রয়েছে, সেখানকার স্থায়ী অধিবাসীদের তুলনায় তাদের দারিদ্রতা ক্রমশ বর্ধিষ্ণু।' (জিউস, ইনসাইক্লোপেডিয়া ' ১ম খণ্ড পৃ: ১৫১)

এ থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ইয়াহুদীদের উপর জাতি হিসাবে লাঞ্ছনা ও অবমাননার ন্যায় নিঃস্বতা ও দারিদ্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা পৃথিবীর মানুষের চোখে পতিত ও মর্যাদাহীন এক জাতি। এ সম্পর্কে আল্লামা রশীদ রেজা মিশরী (রহ.)-এর একটি উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীও তাদেরকে নিঃস্ব মনে করে এবং তারা নিজেরাও নিজেদেরকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও দরিদ্র হিসাবে প্রকাশ করে; যাতে তারা ট্যাক্স বৃদ্ধির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। অবশ্য কতক ইয়াহুদী এমনও রয়েছে যে, তাদের একেকজন পুঁজিপতি এক একটি পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের সমান সম্পদের অধিকারী। এদিক থেকে যদি ইযাহুদী সম্প্রদায়কে ধনী সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে করা যেতে পারে, তবে তাদের এই বিত্ত-বৈভব লাঞ্ছনার পরিপন্থী নয়। একটি লাঞ্ছিত জাতি যদি কখনো সম্পদশালী হয়ে যায় তাহলে এই সম্পদ কখনো সেই লাঞ্ছনার অন্তরায় হয় না। তদুপরি কুরআন যেহেতু তাদের সম্পদ ও প্রাচুর্যের ব্যাপারে

নিরব, কুরআন শুধু তাদের লাঞ্ছনার ব্যাপারে মুখর, অতএব এই লাঞ্ছনা তাদের বিত্ত-বৈভবের সাথেও একত্রিত হতে পারে! এমনকি তাদের দরিদ্রতার সাথেও একত্র হতে পারে।

এমনিভাবে যদি কোন সময় কোন লাঞ্ছিত, নীচাশয় জাতি প্রতারণা ও ছল-চাতুরীর মাধ্যমে পার্থিব কোন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেও নেয়, কিন্তু যদি নিজেদের অসভ্য কার্যকলাপের পরিবর্তন না ঘটায় তাহলে তারা অজস্র সৈন্যসামন্ত ও সামরিক শক্তির মালিক হওয়ার পরও লাঞ্ছিত ও হেয় হিসাবেই পরিগণিত হবে।

অতএব, ধন-সম্পদ ও জাতিগত ঐক্য লাঞ্ছনার পরিপন্থী নয়। কারণ, সম্মান ও অসম্মানের সম্পর্ক কার্যকলাপ ও চরিত্রের সাথে; দৌলত ও হুকুমতের সাথে নয়।

## বিত্ত ও ক্ষমতার সাথে লাঞ্ছনা একত্র হতে পারে

রাসূল (সা.)-এর একাধিক হাদীসে একথা বিধৃত হয়েছে যে, “এমন এক সময় আসবে যখন রাষ্ট্রের আমীর উমারাগণ এমন শ্রেণীর লোক হবে, যাদের তোমরা অভিসম্পাত করবে আর তারা তোমাদেরকে অভিসম্পাত করবে অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মনে করবে আর তারা তোমাদেরকে মনে করবে তাদের নাফরমান।”

কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বলক্ষণাদির বর্ণনায় একথাও বলা হয়েছে যে, “শেষ জামানায় নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর এবং রাখাল শ্রেণীর যাযাবর অসভ্য লোকেরা দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসবে।”

কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, لكع بن لكع “তথা কমিনার ছেলে কমিনা জাতির নেতা হবে।”

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে এটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, জাগতিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর মানুষ সমাজের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিতই বিবেচিত হয়।

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসসমূহে জাগতিক ক্ষমতার পরও যখন তাদেরকে নীচ ও হেয় বলা হয়েছে এবং নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও যখন তাদের উপর কমিনা ও অসভ্যের ঘৃণ্য উপাধি এঁটে দেয়া হয়েছে, তখন এ থেকে

স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, কোন জাতির বিত্ত ও ক্ষমতা তাদের প্রকৃতিগত নীচতা ও জঘন্যতার পরিপন্থী নয়; বরং বিত্ত ও ক্ষমতার সাথে এগুলো একত্রিত হতে পারে। কারণ, সম্মান ও অসম্মানের সম্পর্ক চরিত্র ও কার্যকলাপের সাথে। আর পার্থিব ধন-দৌলত ও হুকুমত (ক্ষমতা)–এর সম্পর্ক আয়-উপার্জন ও চেষ্টা তদবীরের সাথে।

আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ জাতীয় চেষ্টা তদবীর যেমন সৎকর্মশীল ব্যক্তি করতে পারে; তদ্রুপ অসৎকর্মশীল ব্যক্তিও করতে পারে এবং উপায়-উপকরণনির্ভর এই পৃথিবীতে তাদের উভয়ের চেষ্টা তদবীরের উপর ফলাফলও আরোপিত হতে পারে।

নির্গলিতার্থ কথা এই যে, এটা কখনো জরুরী নয় যে, বিত্ত-বৈভব কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতা কেবল সেই জাতিই লাভ করবে যারা আল্লাহর নিকট এবং মানুষের নিকট সম্মান ও গ্রহণযোগ্য। একটি হেয় থেকে হেয়তর জাতি, একটি অসভ্য থেকে অসভ্যতর জাতি কিছু দিনের জন্য সম্পদশালী হতে পারে এবং নিছক ক্ষমতা ও সম্পদের প্রাচুর্য তাদের চারিত্রিক অবনতি এবং কার্যকলাপের নীচতাকে আদৌ আড়াল করতে পারে না।

সুতরাং এ দুটো বিষয় তথা সম্পদ (দৌলত) ও লাঞ্ছনা (জিল্লত) একত্রিত হতে পারে। সৃষ্টিতত্ত্বের এই মূলনীতি সম্পর্কে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে ইয়াহুদীদের বস্তুগত শক্তিও এগুলোর সাথে একত্রিত হতে পারে। যেহেতু কুরআন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব; অতএব এই তিন প্রকারের সাথে অর্থাৎ সম্পদ, রাষ্ট্রক্ষমতা ও বস্তুগত শক্তি এগুলোর সাথেও লাঞ্ছনা একত্রিত হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, কুরআনুল কারীম তাদের মন্দ কার্যকলাপ ও আভ্যন্তরীণ হীনতাকে তাদের লাঞ্ছনার বুনিয়াদ সাব্যস্ত করেছে; সম্পদ ও শক্তি সামর্থকে নয়।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত লাঞ্ছনা চরিত্রগত এবং দীনি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, যার সর্বোচ্চ অর্থ কেবল এটাই হতে পারে যে, ইয়াহুদীরা ফাসেক, কাফের কিংবা আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলা যেতে পারে যে, ইয়াহুদীরা সত্যবিদ্বেষী ও সত্যের দুশমন। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দুনিয়া সম্পর্কিত বিষয়- যা জাগতিক চেষ্টা-তদবীরের সাথে সম্পর্ক রাখে। এগুলো লাভ করার জন্য না মুমীন হওয়া শর্ত আর না কাফের হওয়া শর্ত। আর এজন্য মুখলিছ

হওয়ার শর্তও নেই বা মুনাফিক হওয়ার শর্তও নেই।

রাষ্ট্রক্ষমতা ঈমানদার সম্মানী ব্যক্তিও লাভ করে থাকেন; তদ্রুপ বদকার অসম্মানী ব্যক্তিও লাভ করে থাকে। এজন্য যদি ইয়াহুদীরা চারিত্রিক অধঃপতন সত্ত্বেও কোন ইহজাগতিক ক্ষমতা লাভ করেই থাকে তাহলে তা কুরআনে বর্ণিত লাঞ্ছনার পরিপন্থী হবে না। কেননা, কুরআন তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যাপারে প্রকাশ্য কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। হতে পারে তারা জাগতিক নিয়মে কোন রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করবে, আবার চারিত্রিক লাঞ্ছনাও দস্তুর মুতাবেক বহাল থাকবে।

## ইয়াহুদীদের পরোক্ষ লাঞ্ছনা পার্থিব ক্ষমতার পরিপন্থী নয়

আল কুরআনের ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ আয়াতাংশে ব্যবহৃত الذلة (লাঞ্ছনা) শব্দটির কারণে এই ধারণার উদ্ভব হওয়া সম্ভব যে, ذلت শব্দটি আরবী عزت (সম্মান) এর বিপরীত শব্দ। শব্দগত এই বিশ্লেষণের ফলে স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, ইয়াহুদীদের উপর যেহেতু জিল্লত তথা লাঞ্ছনা আরোপ করা হয়েছে তাই তারা আর ইজ্জত পাবে না। আর ইজ্জতের অন্যতম অনুষঙ্গ যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা ও বস্তুগত শক্তি সামর্থ; সেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতাও তারা লাভ করবে না। যদি তারা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে তাহলে এটা তাদের উপর মোহরকৃত লাঞ্ছনার পরিপন্থী হবে। অতএব, কুরআনে বর্ণিত আয়াতের দাবী হল যে, ইয়াহুদীরা কখনো রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করতে পারবে না। হয়ত বা এরকম একটি ইস্তিমবাত বা গবেষণা থেকেই কিছু কিছু মুফাসসিরীন ইয়াহুদীদের হুকুমত তথা রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন কোনকালেই সম্ভব হবে না মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটি একটি গবেষণা (استنباط) মাত্র; কুরআনের সুস্পষ্ট (نص) ভাষ্য নয়। তাছাড়া পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, এ আয়াতে লাঞ্ছনা দ্বারা পরোক্ষ লাঞ্ছনা (ذلت باطنى) বুঝানো হয়েছে– যা চারিত্রিক অধঃপতন এবং আল্লাহর নিকট অগ্রহণীয় ও মূল্যহীন হওয়ার ফলশ্রুতি। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার ফলশ্রুতি হল মানুষের নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়া।

বস্তুত এই পরোক্ষ লাঞ্ছনা বস্তুগত শক্তি সামর্থ ও প্রচলিত রাষ্ট্রক্ষমতার পরিপন্থী নয়। কারণ, একটি জাতি কিংবা একটি শ্রেণী চূড়ান্ত পর্যায়ের

অধঃপতিত চরিত্র ও কলুষিত কার্যকলাপের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়ার পরও শাসন ক্ষমতার মালিক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রক্ষমতার সম্পর্ক বস্তুজগতের উপায়-উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন, তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার সাথে নয়। অন্যথায় কাফেররা কখনো শাসক হতে পারতো না। অথচ কাফের ও ফাসেক লোকেরা পূর্ব থেকেই তাজ ও তখতের মালিকানা লাভ করে আসছে। অতএব যে জাতিই এই বস্তুজগতের উপায়-উপকরণ আয়ত্তে আনতে পারবে তারাই ক্ষমতার শীর্ষাসনে আরোহণ করবে, বাস্তবে সে আল্লাহর নিকট যত অনাদৃতই হোক না কেন!

কোন ফাসেক পাপাচারি জাতি, এমনকি খোদাদ্রোহী জাতিও যদি নিজেদের আভ্যন্তরীণ অস্থীতিশীলতা দূরীভূত করার পর নিজেদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সদস্যদের শৃংখলাবদ্ধ করে নেয়, নিজে শক্তিধর না হলেও কোন বৃহৎ শক্তিধরের সহযোগিতা নিয়ে সমরবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে নেয়, কৃষি ও চাষবাসে অগ্রগতি লাভ করে, নিজেদের সম্পদ দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভূমি ক্রয় করে একটি বিস্তীর্ণ এলাকার কর্তৃত্বশীল হয়ে যায়, মেহনত ও শ্রমের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি ঘটায়, শিল্প কারিগরি ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে কারো থেকে পিছনে না থাকে এবং নিজেদের পুঁজি কুক্ষিগত করার পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণে ব্যয় করার অভ্যাস গড়ে তুলে তাহলে উপরোক্ত বস্তুগত উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী না হওয়ার কোন কারণ নেই। সে জাতি ইয়াহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান। বর্তমান পৃথিবীর যে সকল জাতি এসব উপায়-উপকরণ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে (তারা আল্লাহর দুশমনই হোক কিংবা শুধু আল্লাহর নিকটই নয়; বরং মানুষের নিকটও চরিত্রের মাপকাঠিতে লাঞ্ছিত হোক) কেবল তারাই জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পারছে। আল্লাহ তা'আলা কোন জাতি থেকেই বস্তুগত উপায়-উপকরণ এবং এগুলোর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছিনিয়ে নেন না।

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

"আমরা তাদেরকেও সহযোগিতা; (বস্তুগত উপায়-উপকরণের মাধ্যমে) দান করব এবং তাদেরকেও। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ নিয়ন্ত্রিত নয়।"

আরো ব্যাপকতার সাথে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِـهٖ مِنْهَا

"যারা দুনিয়ার ক্ষেত-খামারের প্রত্যাশা করে আমরা তাদেরকে তার অংশ বিশেষ প্রদান করব।"

এই প্রকৃতিগত মূলনীতির অধীনে ইয়াহুদীদের উপরও কুরআন এমন কোন বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেনি যে, ইয়াহুদীরা এ সকল তদবীর গ্রহণ করতে পারবে না।

মোটকথা, ফিস্ক ও পাপাচার এবং কুফর ও সীমালংঘনের পরোক্ষ লাঞ্ছনা এক জিনিস আর দুনিয়ার চেষ্টা-তদবীর আরেক জিনিস, দুটোর মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। বর্তমানে পৃথিবীর কয়টি জাতি এমন আছে যারা সত্যাবলম্বনের মাপকাঠিতে পূর্ণাঙ্গরূপে উতরাতে পারবে? কিন্তু দেখা যাচ্ছে, জাগতিক উপায়-উপকরণ আয়ত্তে এনে তারা দুর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী হয়ে বসে আছে।

বর্তমান পৃথিবীতে খৃষ্টজগতের জয় জয়কার, তাদের প্রভাব কর্তৃত্ব বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারপরও তাদেরকে চারিত্রিক বিচারে নীচ ও ঘৃণিত মনে করা হয়। কারণ, তারা ফিস্ক, পাপাচার, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, শঠতা, প্রতারণা ইত্যাদিকে নিজেদের ভৌগোলিক চৌহদ্দির ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং নিজেদের উপায়-উপকরণ ও মিডিয়ার মাধ্যমে সেগুলো গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর মেযাজকেই পাপাচারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, সাময়িকী-প্রবন্ধ রাতদিন তাদের এসব কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করছে, চারিত্রিক বলয়ে তাদেরকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জ্ঞান করছে এবং এর প্রকাশ্য ঘোষণাও দিচ্ছে, কিন্তু তারপরও তাদের শক্তিকে স্বীকার করে তাদের শক্তির সামনে নিজেদের দুর্বল ও অক্ষম মনে করার কারণে কিছুই করতে পারছে না। সুতরাং খৃষ্টানদের মাঝে যেভাবে চারিত্রিক পংকিলতা ও জাগতিক শক্তির সমন্বয় ঘটেছে তদ্রুপ সমন্বয় যদি ইয়াহুদীদের

মাঝেও ঘটে তাহলে জাগতিক উপায়-উপকরণের দৃষ্টিতে তাদের উপর আপত্তি উঠবে কেন? তাছাড়া আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হবার পরও তারা যদি নিজেদের ব্যবস্থাপনা কিংবা কোন বৃহৎ শক্তির সাহায্য অথবা বৃহৎ শক্তির উস্কে দেয়ার কারণে তাদের দর্পণ হিসাবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেও নেয় তাহলে এতে কুরআনের আলোকেই বা বাধা কোথায়?

কেননা, কুরআনে কারীম শুধুই ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনার মোহর লাগিয়েছে জাগতিক ক্ষমতা থেকে নিবৃত্ত করার মোহর লাগায়নি। এজন্য যদি তাদের জাগতিক শক্তি অর্জিত হয়, তাহলে তা তাদের উপর মোহরকৃত লাঞ্ছনার পরিপন্থী হবে না।

## ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা মুক্তির কুরআনী দিক নির্দেশনা

দ্বিতীয় কথা হল, এই যে লাঞ্ছনা– যার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহুদীদের জাগতিক ও সামাজিক শক্তিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং যার কারণে কখনোই তাদের শক্তি ও সম্মান লাভ হবে না বলে মনে করা হচ্ছে, আর মনে করা হচ্ছে যে, কোথাও এই সম্মান ও শক্তি অর্জিত হয়ে গেলে তা আবার কুরআনের বিঘোষিত লাঞ্ছনার পরিপন্থী না হয়ে যায় এবং কুরআনের উপর অসত্যের কোন চাপ লেগে না যায়। বস্তুত তা কুরআনের কোন অমোঘ ও চিরন্তন ঘোষণাই নয় যে, এরূপ একটি সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে? এই সন্দেহ তো তখন হওয়া সম্ভব ছিল যদি এই লাঞ্ছনা কুরআনের এমন দ্ব্যর্থহীন ও অটল হত যে, তা কখনো দূরীভূত হবে না! কুরআন তো স্বয়ং এই লাঞ্ছনাকে অস্থায়ী ও শর্তাধীন স্থির করেছে এবং কুরআন চেয়েছে ইয়াহুদীরা এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাক, সম্মান পাক এবং আজীবন লাঞ্ছিত না থাকুক।

বস্তুত এই সুস্পষ্ট কিতাব যেখানে তাদের উপর লাঞ্ছনা আরোপ করেছে সেখানে সে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির উপায়ও ইয়াহুদীদের সামনে উপস্থাপন করেছে। অতএব, তারা চাইলে নিজেদের এই লাঞ্ছনার সমাপ্তিও ঘটাতে পারে।

যে আয়াতে ইয়াহুদীদের উপর সর্বদেশীয় ও সর্বকালীন লাঞ্ছনা আরোপের ঘোষণা দেয়া হয়েছে সে আয়াতে পাশাপাশি লাঞ্ছনা স্খলনের একটি ব্যতিক্রম

পথের সন্ধানও দেয়া হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, বর্ণিত লাঞ্ছনা এমন কোন দুরপনেয় অটল বিষয় নয়, যা দূর করা যাবে না। ইরশাদ হয়েছে :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اِلَّابِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

"তাদের জন্য জাহেরী জিল্লতী ও পরোক্ষ লাঞ্ছনাকে অবধারিত করে দেয়া হল, যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন। তবে আল্লাহর রশি কিংবা মানুষের রশি ধারণ করলে সে ভিন্ন কথা।"

অভিধানে حَبْلٌ শব্দটি রজ্জু বা রশির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে মুফাসসিরীনে কেরামের তাফসীর অনুযায়ী 'অঙ্গীকার' বা 'লাঞ্ছনা মুক্তির উপায়' (سَبَب) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই উপায় চাই স্রষ্টার পক্ষ থেকেই হোক কিংবা সৃষ্টির পক্ষ থেকেই হোক, তাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় এই যে, ইয়াহুদীরা যদি সত্যি সত্যি তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সম্পূর্ণরূপে লাঞ্ছনা মুক্ত হয়ে যাবে। পরোক্ষ লাঞ্ছনাও থাকবে না, প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনাও থাকবে না। তারা মুসলমান হয়ে গেলে ঈমান ও ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সম্মান ও সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। একজন মুসলমান যে অধিকার লাভ করে তারাও সে সব অধিকার লাভ করবে। তবে তারা যদি ইসলাম কবুল না করে ইয়াহুদীই থেকে যায়, তাহলে حَبْلُ النَّاسِ তথা সৃষ্টির পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় হবে– ইসলামের শান-শওকত মেনে নিয়ে জিম্মি হয়ে থাকা। এক্ষেত্রে পরোক্ষ লাঞ্ছনা বহাল থাকবে বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। অর্থাৎ জিযিয়া পরিশোধজনিত লাঞ্ছনা বহাল থাকবে কিন্তু ব্যাপক অসহায়ত্ব ও লোকনিন্দা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

এই দ্বিতীয় সুরতে ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিধানানুযায়ী তাদের সামাজিক অধিকার, বিশেষত আর্থিক লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার অনেকাংশে তাই থাকবে যা একজন মুসলমানের থাকে।

لَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا علَيْنَا " যে অধিকার আমাদের জন্য হবে তাই তাদের জন্য হবে এবং যে দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে তা তাদের উপরও বর্তাবে।" অর্থাৎ তাদের জান মালের নিরাপত্তা বিধান মুসলমানের উপর

বর্তাবে। অনুরূপভাবে তারা যদি অন্য সম্প্রদায়ের জিম্মি হয় তাহলে তাদের লেনদেনকে সেই সম্প্রদায়ের নীতির আলোকে বিচার করা হবে। বস্তুত যখন যেখানেই ইয়াহুদীরা এই জিম্মিত্ব তথা অধীনতা কবুল করেছে, দেখা গেছে সেখানে তাদের প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা আর অবশিষ্ট থাকেনি।

প্রাথমিক যুগে তারা যখন এই অধীনতা মেনে নিয়েছিল তখন তারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ইজ্জত সম্মানের প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়ে ছিল যা ইয়াহুদীদের সাথে রাসূল (সা.)-এর বিভিন্ন সৌজন্যমূলক লেনদেন দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি তাদের সাথে লেনদেনও করতেন, তাদের থেকে ধার-কর্জও নিতেন। তাদের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রূষাও করতেন। আবার তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। তারা মসজিদে নববীতে হাজির হয়ে তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করত; আর রাসূল (সা.) যথাযোগ্য সৌজন্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে তাদেবকে কৃতার্থও করতেন। একই আচরণ ছিল খোলাফায়ে রাশেদীন–এর যুগে। কিন্তু তারা যখন গাদ্দারী এবং ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিল তখন এর শাস্তি ভোগ করতে হল এবং পূর্ববৎ লাঞ্ছনা ফিরে আসল।

অত পব এভাবে যে দেশেই তারা বাস করেছে সাধারণ প্রজা ও জিম্মি হয়েই বাস কবেছে। মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানদের জিম্মি হয়ে বাস করেছে আব অমুসলিম দেশগুলোতে (ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ, রাশিয়া ব্যতীত) অমুসলমানদের জিম্মি হয়ে বাস করেছে। উভয় স্থানে حَبْلُ النَّاسِ তথা সৃষ্টির পক্ষ থেকে সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে তাদের লাঞ্ছনা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দূবীভূত হয়েছিল ইসলামী দেশগুলোতে শরয়ী মূলনীতির ভিত্তি[illegible] তাদেব উপব জিম্মিদের বিধানাবলী জারী করা হত। যে কারণে অধিকার [illegible]লনদেনেব ক্ষেত্রে তারা বলতে গেলে মুসলমানদের সমকক্ষই ছিল শুধুমাত্র জিযিযা ইত্যাদির বাহ্যিক লাঞ্ছনা অথবা সেই পরোক্ষ লাঞ্ছনা বহাল ছিল কিন্তু এতে লেনদেন ও অধিকারজনিত সমতায় কোন পার্থক্য সূচিত [illegible]ত না ইউরোপীয় দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা হওয়ায় জনগণেব জন্য যখন সমঅধিকাবেব ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হয় (যার সিংহভাগ গ্রহণ কবা হযেছে ইসলামী মূলনীতি থেকে এবং তারা নিজেরাই একথা স্বীকাব কবেছে, [illegible]াছাড়া তাদের আইনসমূহও এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ)

তখন ইয়াহুদীরা এ থেকে বেশ লাভবান হয় এবং গণতন্ত্র নামের এই নব্য জিম্মিত্ব দ্বারা তারা খৃষ্টজগতের দৈত্যসুলভ আধিপত্য থেকে বহুলাংশে মুক্তি পায়। তবে এক্ষেত্রে জিম্মিত্বের রূপ-আঙ্গিক ইসলামী জিম্মিত্ব থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও মোটের উপর তখনও তাদের জিম্মিত্ব বহাল ছিল। সুতরাং তারা জিম্মিত্বের শর্ত যতটা পূর্ণ করেছে তাদের বাহ্যিক লাঞ্ছনা ঠিক ততটাই হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ লেনদেনজনিত লাঞ্ছনা শেষ হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক লাঞ্ছনা বহাল রয়েছে।

মোদ্দাকথা, কুরআনে কারীম তাদের ব্যাপারে কোন চিরন্তন ও সর্বকালীন লাঞ্ছনার ঘোষণা দেয়নি, যাকে ইয়াহুদীদের জাগতিক শক্তির পরিপন্থী মনে করা যেতে পারে। বরং কুরআনে কারীম লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় বলে দিয়ে লাঞ্ছনাকে স্খলনযোগ্য ও শর্তসাপেক্ষ আখ্যা দিয়েছে।

অতএব, স্বয়ং এই লাঞ্ছনাই যখন অটল কোন বিষয় নয় তখন এ থেকে ইয়াহুদীদের শক্তি ও সম্মানের ক্ষেত্রে চিরন্তন ও অবাধ ঋণাত্মক রায় কায়েম করা শুধু কুরআনের উপর মনগড়া সংযোজনই নয়; বরং কুরআনের অর্থের খেলাফ এবং নতুন দাবী উঠানোর নামান্তর।

এবার রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। রাষ্ট্র দু'ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১. পরনির্ভর অস্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র। অর্থাৎ অন্যের শক্তি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এতে প্রকৃত ক্ষমতা থাকে অন্যের হাতে। আর বাহ্যত যারা ক্ষমতার সাথে জড়িত থাকে, শাসন ক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা হয়ে পড়ে অন্যের হাতের পুতুল। কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, قَادِرٌ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ অন্যের শক্তিতে শক্তিমান এবং مُقْتَدِرٌ بِاقْتِدَارِ الْغَيْرِ "অন্যের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান এটাকে 'সরকাব' নাম অবশ্যই দেয়া যায়, তবে এটা প্রকৃত সরকার নয়; বরং 'পুতুল সরকার।'

২. স্বনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র। যাতে অন্যেব সাহায্য ছাড়াই নিজেদের শক্তি ও শাসন কার্যকর থাকে। সুতরাং যতদূর অস্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রের সম্পর্ক, তাতে ইয়াহুদীরা নিজেদের শাসন ব্যবস্থায় অন্যদের অনুগত। উপরন্তু অন্যদের হাতের ক্রীড়নক। অতএব, তারা যদি কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সাহায্য

নিয়ে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং নিজেদের চিরাচরিত লাঞ্ছনা দূর করতে সক্ষম হয়, তাহলে এটাও حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ এরই একটি পর্যায় হবে মাত্র– যা কুরআনে বর্ণিত লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় সমূহেরই একটি প্রক্রিয়া বৈ কিছু নয়।

## ইসরাইল : মূলত বৃটেন ও আমেরিকার সেনা ছাউনি

বস্তুত ইয়াহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্র, যার নাম রাখা হয়েছে ইসরাইল; তা প্রথম প্রকার রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন তাদের ব্যাপারে লাঞ্ছনার যে দাবী করেছে এ রাষ্ট্র কোনক্রমেই সেই লাঞ্ছনার পরিপন্থী নয়। কেননা, ইসরাইল প্রকৃত অর্থে ইয়াহুদীদের সরাসরি নিজস্ব কোন রাষ্ট্রই নয়; বরং তা বৃটেন ও আমেরিকার সেনা ছাউনি। এ রাষ্ট্র ইয়াহুদীদের প্রয়োজনে নয়; বরং নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই তারা তা প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে হ্যাঁ, ইয়াহুদীরাও এ ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে বৈ কি!

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বৃটেন ও অন্যরা ইয়াহুদীদের ইসরাঈলের গদিতে বসিয়েছে বটে, কিন্তু এরই পাশাপাশি ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠাতা খৃষ্টসমাজ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়েও ইয়াহুদীদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা অন্তরে পোষণ করে না; বরং তাদের লাঞ্ছিত বলেই মনে করে। এই আমেরিকান ও বৃটিশ খৃষ্টানরা যারা আজ ইয়াহুদীদের সহযোগিতায় আদাজল খেয়ে লেগেছে, তারা যে কেবল ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইয়াহুদীদের ঘৃণ্য মনে করত তাই নয়; বরং আজও তারা ইয়াহুদীদের প্রতি অন্তরে তথৈবচ ঘৃণা পোষণ করে। কারণ, তারাতো ইয়াহুদীদের প্রয়োজন পূরণার্থে নয়; বরং নিজেদের কিছু নাপাক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে সামনে রেখে সদ্যপ্রসূত ইসরাইল নামক দেশটাকে নিজেদের উপনিবেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। অতএব, ঠিক এ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মুহূর্তেও তাদের অন্তরে ইয়াহুদীদের প্রতি একরাশ ঘৃণাই প্রচ্ছন্ন ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যখন বৃটেন ও আমেরিকা ইসরাঈলের ঢাকঢোল পিটাচ্ছিল তখন জার্মানীরা বিশ্ব মানুষের সামনে ইয়াহুদীদের স্বরূপ উম্মোচন করে দিয়েছিল। বৃটেনের প্রসিদ্ধ বহুল প্রচলিত পত্রিকা 'লন্ডন

টাইমস'-এ এই বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছিল। বৃটেনের সংবাদদাতারা এর উপর কোন আপত্তি ও সমালোচনা করেননি। কারণ, জার্মানীদের এই স্বরূপ উন্মোচনকে বৃটিশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল।

সর্বোপরি কথা হল, ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠালগ্নেও এই দুই জাতি (বৃটিশ ও জার্মানী) ইয়াহুদীদের এই বাস্তবতার উপর একমত ছিল যা জার্মানীরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছিল। জার্মানীরা বলেছিল, "ইয়াহুদীরা পৃথিবীর এক নিকৃষ্টতম ঘৃণ্য জাতি। ইসরাইল ইয়াহুদীদের রাষ্ট্র নয়; বরং তা বৃটেন ও তার মিত্র বাহিনীর রাষ্ট্র।"

জার্মানীর প্রচারমন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস-এর প্রবন্ধটি শিরোনামসহ হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

## রক্তচোষা জাতি

লন্ডন টাইমস-এর সংবাদদাতার বর্ণনা, নাৎসী শাসনের সম্প্রচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস নাৎসী কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে ইয়াহুদীদের স্বরূপ উন্মোচন করে বলেছেন যে, ইয়াহুদীরা অন্যের রক্তে উদরপূর্তকারী এক ভয়ানক সম্প্রদায়। যে বাস্তবতাকে জার্মানীরা এখন উপলব্ধি করতে পেরেছে- সম্ভবত ইংরেজরা তা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, জার্মানীরা এই ভয়ানক মানবরূপী জোঁকদেরকে দেশ রক্ষার স্বার্থে নিজেদের দেশ থেকে চেছে খুদে বের করে দিয়েছে; আর ইংরেজরা এদের ভয়ানক গুণ দ্বারা ফায়দা উঠানোর জন্য এদেরকে প্রতিপালন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করেছে যাতে তারা যে দেশকে নিজেদের উপনিবেশ বানাতে চায় এবং যেখানে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়, সেখানে যেন সর্বপ্রথম এই জোঁকদের একটি বাহিনী প্রেরণ করতে পারে এবং এই রক্তপায়ী জাতি তথাকার মানুষের রক্ত চুষে তাদেরকে বেকার ও মৃতবৎ বানিযে ফেলতে পারে। আর ইংরেজরা যেন নির্ভয়ে নির্বিবাদে সহজেই সেই দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের কাছ থেকে চিরস্থায়ী গোলামীর পাট্টা লিখে নিতে পারে এবং তাদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ এই পোষা জোঁকগুলোর যোগ্যতার সর্বপ্রথম পরীক্ষা ফিলিস্তিনে নেয়া হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই পরীক্ষা সফল প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বাস না হলে ফিলিস্তিনে গিয়ে সেখানকার আরবদের অবস্থা নিজ চোখে দেখে আসুন। মাত্র কয়েক বছরের স্বল্প সময়ে তাদেব বক্তিম চেহারা খুনের লালিমা থেকে বঞ্চিত হয়ে কিরূপ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

(ইস্তিক্‌লালে দেওবন্দ, পৃ: ৩, খণ্ড ২, ন ১৩৪, সেপ্টেম্বর, রজব ১৯৫৫ ইং)।

অনুরূপভাবে যে আমেরিকাকে এদের পৃষ্ঠপোষকতায় আগে আগে দেখা যায় তারাও এদেরকে লাঞ্ছিত ও ভূ-পৃষ্ঠের 'কালো দাগ' বলে মনে করে এবং তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষেত্রে তারাও জার্মানী ও বৃটেন থেকে আলাদা নয়।

দিল্লীর 'দৈনিক দাওয়াত' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় কলামে লেখা হয়েছিল যে, সম্প্রতি তিনজন আমেরিকান বিজ্ঞ লেখক "ইয়াহুদীদের ব্যাপারে আমেরিকান জনসাধারণের অভিমত"-এর উপর তিনটি বই লিখেছেন। একটি সোভিয়েত পত্রিকা এর উদ্ধৃতি দিয়েছে এভাবে যে, এই তিনটি বইয়ে ১৯৫৪ সাল থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইয়াহুদীদের প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রমাণ পাওয়া যায়। রবার্ট অগাষ্টার এমন পঁচিশটি সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো ইয়াহুদীদের প্রত্যক্ষ দুশমন। উক্ত লেখক এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করেছেন যে, মিল-ফ্যাক্টরী, অফিস-আদালতে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইয়াহুদীদেরকে সর্বশেষে চাকুরী দেয়া হয় এবং সর্বপ্রথম তাদেরকে চাকুরীচ্যুত করার টার্গেট বানানো হয়। শিল্প ও কারিগরীর বিভিন্ন ময়দানে বিশেষত ভারী অস্ত্রের ট্রেনিং, বিমান ও সামরিক বিভাগ এবং সেনাবাহিনীর কোন গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী শিল্পে ইয়াহুদীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত চাকুরী দেয়া হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সায়েন্স বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। একই অবস্থা ইউনিভার্সিটিতেও। শহরের অভিজাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এলাকায় তাদের বসবাসের স্থান হয় না। চিত্তবিনোদন কেন্দ্র এবং অধিকাংশ ক্লাবে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কোথাও কোথাও এমন সাইনবোর্ডও ঝুলানো দেখা যায় যে, "এখানে ইয়াহুদীদের প্রবেশ নিষেধ।"

তিনশত বছরের অধিক সময় ধরে ইয়াহুদীরা আমেরিকায় বসবাস করে আসছে এবং এদের অধিকাংশই শেতাঙ্গ বাসিন্দা। কিন্তু তারপরও এদের লিডারদের ষড়যন্ত্রমূলক সাজেশী মানসিকতার কারণে অদ্যাবধি এরা সেখানকার সমাজের বিশ্বাসী শ্রেণীতে পরিণত হতে পারেনি। (দৈনিক দাওয়াত, দিল্লী ২৪ শে এপ্রিল, ১৯৭০ সম্পাদকীয় কলাম, শিরোনাম– আমেরিকান ইয়াহুদী।)

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ইয়াহুদীদের পৃষ্ঠপোষক বন্ধুদের সহযোগিতার অবস্থাই যখন এমন, তখন পৃথিবীর অপরাপর মানুষ যদি তাদের ব্যাপারে এর চেয়েও বেশি অবজ্ঞা ও ঘৃণার মানসিকতা পোষণ করে, তাহলে এতে অসম্ভাব্যতার কিছু নেই।

আজ পর্যন্ত ইয়াহুদীদের এই বিরতিহীন লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার হাল যা এমন লোকদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যাদেরকে ইয়াহুদীদের মিত্র বলে মনে করা হয়; তা আবার এমন এক সময়ে প্রকাশ পাচ্ছে যখন বাহ্যত: ইয়াহুদীরা একটি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করতে পেরেছে- এ মূলত সেই খোদায়ী সীলকৃত লাঞ্ছনারই প্রতিফল যা তাদের প্রতারণার কারণে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

## জাগতিক শক্তি ও চারিত্রিক অধঃপতনের সমন্বয় ঘটতে পারে

মোটকথা, কুরআনের সুস্পষ্টভাষ্যই গ্রহণ করা হোক; কিংবা যুগের ঘটনা প্রবাহই পর্যবেক্ষণ করা হোক, এ দু'য়ের কোনটির প্রেক্ষিতেই জাগতিক শক্তি এবং চারিত্রিক অধঃপতনের মাঝে যে কোন বৈপরিত্য নেই এবং এ দুটো যে একত্রিত হতে পারে এ ব্যাপারে কোন অস্বীকৃতি নেই। জার্মানী, বৃটেন ও আমেরিকা ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার কথাও স্বীকার করে; আবার একই সাথে তাদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করত এর জন্য স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা তদবীরের ক্ষেত্রেও তাদের কোন অনীহা নেই। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের দৃষ্টিতে যেমন কারো প্রকৃতিগত লাঞ্ছনা এবং তার বস্তুগত শক্তির মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কাছেও এ দুটো বিষয়ের একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব-দ্বিমত নেই।

## ইসরাইল মূলত আমেরিকা ও বৃটেনের ক্রীড়নক এক নব্য উপনিবেশ

ঘটনা দৃষ্টে যতটুকু বুঝা যায় তাতে ইয়াহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্র ইসরাইলকে বাহ্যিকভাবে ইয়াহুদীদের রাষ্ট্রই মনে করা হয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ রাষ্ট্র তাদেরই আয়ত্তাধীন যারা এ রাষ্ট্রকে নিজেদের বল প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা করেছে। আব তারা নিশ্চয়ই ইয়াহুদী নয়; বরং বল প্রয়োগকারী শক্তি হল বৃটেন ও

আমেরিকা। যদি আরবরা আজ ইসরাঈলের উপর হস্তক্ষেপ করতে ইতস্তত করে তাহলে তা ইসরাঈলের পরনির্ভর দুর্বল সামরিক শক্তির কারণে নয়; বরং তাদের ভয়ের কারণ ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকান স্বনির্ভর শক্তি। যেমন– ১৯৫৬ সালে যখন সুয়েজ খালের উপর আক্রমণ হয় তখন বৃটেন এবং ফ্রান্স পর্দার বাইরে এসে প্রকাশ্যে খুল্লমখুল্ল ইসরাঈলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল; ইসরাইল নিজে কোন শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করেনি। আজও যদি ইসরাইল মিসর এবং আরব দেশগুলোর সাথে যুদ্ধ করে তাহলে ইসরাঈলের পাশে এসে আমেরিকা মূল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে; ইসরাইল নয়। তাছাড়া আমেরিকা ও বৃটেন ধোঁকা দিয়ে ইসরাইল নামক যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে তা মূলত আরবদের শক্তি খর্ব করা কিংবা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা অথবা আরব বিশ্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই করেছে। ইয়াহুদীদের প্রতি সহানুভূতি বা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা তাদেরকে শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া কিংবা তাদেরকে মর্যাদাশীল মনে করে তাদের শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য করেনি। আজ যদি খৃষ্টানবিশ্ব ইয়াহুদী কিংবা ইসরাঈলের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে ইসরাঈলের এতটুকু শক্তি নেই যে, তারা আরবের কোন একটি দেশের মুকাবেলায় দাঁড়াবে! সুতরাং ইয়াহুদীরা পশ্চিমা-শক্তি ও তাদের ডিপ্লোমেসির অধীনে খোদ তাদের স্বীকারোক্তি অনুসারে ক্রীড়নক বা কর্ম সম্পাদনের হাতিয়ারের মর্যাদার চেয়ে বেশি কিছু গুরুত্ব রাখে না। যেমনটি ইতোপূর্বের লন্ডন টাইমসের সংবাদ থেকে বুঝা যায়। তারা তখনো খৃষ্টানদের অধীন ও কর্মসহযোগী ছিল যখন ইসরাইল রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আর আজ যখন তাদের সহযোগিতার কারণে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তখনও তেমনই রয়ে গেছে। এজন্য ইসরাইল যে প্রকৃত অর্থে ইয়াহুদীদের কোন রাষ্ট্র নয় এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদীরা 'অন্যের শক্তিতে শক্তিমান' এবং 'অন্যের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান' হওয়ার মূলনীতিতে যদি ইসরাইল রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্বশীল হয়ও তবুও এটা না ইয়াহুদীদের শক্তি ও ক্ষমতা হিসাবে বিবেচিত হবে আর না তারা কোনভাবে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বীর্যবান শাসক হিসাবে পরিগণিত হবে।

বাহ্যত এমন পরাধীন ও পরক্ষমতানির্ভর ইয়াহুদী শাসন পূর্বোক্ত লাঞ্ছনার পরিপন্থী হবে কোথেকে? বরং এটাতো তাদের লাঞ্ছনার প্রমাণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, ইয়াহুদীরা এতটুকু ক্ষমতা পেয়েও অন্যের অধীনস্থতা হতে মুক্ত হতে পারেনি এবং লাঞ্ছনার কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি; বরং তাদের সেই পরমুখাপেক্ষিতা ও অন্যের অধীনস্থতা পূর্ববৎ বহাল তবিয়তেই বাকী রয়েছে।

অতএব এতে করে তাদের জন্মগত লাঞ্ছনার উপর কি প্রভাব পড়ছে? বরং অন্যের ক্রীড়নক হওয়ার কারণে এই লাঞ্ছনা আরো বেড়ে গেছে।

**উপসংহার :** সারকথা এই যে, কুরআনে কারীমের ঘোষণা অনুযায়ী ইয়াহুদীরা যদি حَبْلٌ مِّنَ اللّٰهِ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় গ্রহণ করে তাহলে লাঞ্ছনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন– ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব সৌভাগ্যবান ইয়াহুদী حَبْلٌ مِّنَ اللّٰهِ কে আঁকড়ে ধরেছিলেন তারা লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার সম্মান লাভ করেছিলেন। আর যদি حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ তথা সৃষ্টির পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় গ্রহণ করে তাহলে আংশিক লাঞ্ছনা বিলুপ্ত হবে মাত্র, পরিপূর্ণরূপে নয়। যেমন– ইসলামের প্রথম যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগে ইয়াহুদীরা حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ এর অধীনে জিম্মি হয়ে এক প্রকার জাহেরী সম্মান লাভ করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথমাবস্থায় তারা ইয়াহুদীই ছিল না এবং পূর্ণ সম্মান লাভ করতে পেরেছিল। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তারা ইয়াহুদীই ছিল, তবে ভিন জাতির অনুগত ও শাসিত থেকে মোটের উপর কিছুটা জাহেরী সম্মান লাভ করতে পেরেছিল। তৃতীয় অবস্থা হল, তারা ইয়াহুদী থেকেই কোন বৃহৎ শক্তির আশ্রয়ে তাদের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করা। যেমন সাম্প্রতিক সময়ের ইয়াহুদীদের ইসরাইল রাষ্ট্র। তবে এটাও এক ধরনের জিম্মিত্ব; যাকে আধুনিক পরিভাষায় অঙ্গীকারাবদ্ধতা ও দায়বদ্ধতা নামে অভিহিত করা যায়। এটিও حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ এর একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ এর প্রথমাবস্থায় তারা নিজেরা ব্যক্তি হিসাবে জিম্মি থাকে আর দ্বিতীয় অবস্থায় তাদের নামেমাত্র রাষ্ট্রটিই জিম্মি হয়ে যায়। অতএব, এ দু'য়ের কোনটিই কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত লাঞ্ছনার পরিপন্থী নয়। কেননা, উভয় অবস্থাতেই অন্য জাতির আধিপত্য তাদের উপর বহাল থাকে। তন্মধ্যে একটিতে ব্যক্তির উপর আধিপত্য আর অন্যটিতে রাজনৈতিক আধিপত্য থাকে এই যা– এ দু'টো অবস্থাই ইয়াহুদীদের পরোক্ষ লাঞ্ছনার সাথে একত্র হতে পারে।

বাহ্যত এই তিনটি অবস্থাই যখন কুরআনে বর্ণিত حبْلٌ مّنَ النَّاس এর অধীনে রয়েছে তখন বিষয়টি কুরআনের ব্যাপক অর্থের পরিমণ্ডলের বাইরে যায় না বিধায় তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের কারণে কুরআনের খেলাফ হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

উপরোক্ত তিনটি অবস্থা ছাড়া চতুর্থ আরেকটি অবস্থা রয়েছে, তাহল ইয়াহুদীরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হবে। অর্থাৎ ইয়াহুদীরা ইয়াহুদী থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় গ্রহণ কিংবা সৃষ্টির পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা মুক্তির উপায় গ্রহণ না করেও তারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হবে। ইয়াহুদীদের এ ধরনের স্বাধীন রাষ্ট্র লাভের ব্যাপারে কুরআনে কারীম ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন মন্তব্যই করেনি; বরং সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করে একে যুগের অবস্থাদির উপর ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া এ ধরনের স্বাধীন রাষ্ট্র লাভের দ্বারাও তাদের উপর কুরআন কর্তৃক আরোপিত লাঞ্ছনার উপর কোন প্রভাব পড়বে না, যেমন ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখিয়েছি।

## সব যুগেই ইয়াহুদীরা ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের অনুগত ছিল

সর্বশেষ উল্লিখিত এই চতুর্থ অবস্থাটি এজন্য অসম্ভব মনে হয় যে, প্রথমত ঐতিহাসিকভাবে ইয়াহুদীরা কখনো পরাধীনতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর আবির্ভাবের পর ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী একমাত্র মুসলমানরাই ছিলেন। ইয়াহুদীরা দীর্ঘ এক হাজার বছর মুসলমানদের পরাধীন ছিল। এক হাজার বছর অতিক্রান্ত

হওয়ার পর মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পতন শুরু হয়। খৃষ্টানরা কূটিল ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশে মেতে উঠে। মুসলমানরা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। নিজেদের হীন কার্যকলাপ ও পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে নিজেদের ক্ষমতা ও রাজ্যগুলো একে একে খৃষ্টানদের জন্য ছেড়ে দিতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ ভূ-খণ্ডেই খৃষ্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ইসলামের দ্বিতীয় সহস্রাব্দে খৃষ্টান দেশগুলোর ইয়াহুদী অধিবাসীরা মুসলমানদের রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে খৃষ্টানদের পরাধীনতার নিগড়ে বন্দী হয়ে যায়। কিন্তু সর্বাবস্থায় ইয়াহুদীরা ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের অধীনতার বাইরে যেতে পারেনি।

## ইয়াহুদীদের জাগতিক সম্মান ও চারিত্রিক লাঞ্ছনার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই

আজ যখন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখনও তারা ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের (খৃষ্টানদের) অধীনেই রয়েছে। এমনকি তাদের তথাকথিত রাষ্ট্রও বাস্তব বিচারে তাদেরই (খৃষ্টানদের) প্রভাবাধীন ও শাসনাধীন। এজন্য মন কখনো এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না যে, কোন সময় ইয়াহুদীরা তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে সুদৃঢ় করতে পারবে।

তাছাড়া কুরআনের ঘোষণাকৃত ইয়াহুদীদের ঐতিহাসিক লাঞ্ছনাও মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে আছে, যা এখনও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। এজন্য সন্দেহ করা যেতে পারে যে, জিল্লত (লাঞ্ছনা) যখন ইজ্জত (সম্মান)-এর বিপরীত; আর রাষ্ট্রক্ষমতার চেয়ে বড় কোন বাহ্যিক ইজ্জত নেই; অতএব জিল্লত বিদ্যমান থাকাবস্থায় এই ইজ্জত তথা স্বাধীন হুকুমত (রাষ্ট্রক্ষমতা) তাদের কিভাবে অর্জিত হবে?

সম্ভবত এর ভিত্তিতেই কতিপয় মুফাসসিরীনে কেরাম ইয়াহুদীদের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে চিরতরে অস্বীকার করে দিয়েছেন। কিন্তু জাহের কথা, এটি একটি গবেষণাপ্রসূত চিন্তা (استنباط) মাত্র। এই চিন্তা কুরআন থেকেই উদ্ভুত হোক কিংবা ঘটনা প্রবাহ থেকেই হোক, এটা কুরআনের সরাসরি ভাষ্য (نص) নয়। আর যতটুকু স্পষ্টভাষ্যে বর্ণিত আছে, তা এই হুকুমত ও রাষ্ট্র

ক্ষমতাকে অস্বীকার করে না; পরিপন্থী হওয়াতো দূরের কথা। যেমনটি আমরা উপস্থাপন করেছি যে, এই জিল্লত বাতেনী লাইনের বিষয় আর ইজ্জত জাগতিক লাইনের বিষয়। এ দু'য়ের মাঝে কোন সংঘাত বা বৈপরীত্য নেই।

এজন্য যদি কোন সময় ইয়াহুদী সম্প্রদায় তার পশ্চিমা প্রভু ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিপক্ষ হিসাবেও অবস্থান গ্রহণ করে তাহলে তাদের লাঞ্ছনার যে ভিত্তি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা যথাযথভাবে বহাল থাকবে এবং লাঞ্ছনার যে গহ্বরে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে সেই গহ্বর থেকে কোন দিনই তারা বেরিয়ে আসতে পারবে না। কেননা, আমরা এ কিতাবের শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, তাদের এই লাঞ্ছনা কোন জাতির দুশমনি, শত্রুতা কিংবা নিছক আবেগ তাড়িত হয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত মনে করার কারণে নয়; বরং খোদ ইয়াহুদীদের আভ্যন্তরীণ ঔদ্ধত্য ও বাহ্যিক অনিষ্টচারিতার কারণে তাদের উপর এটা চেপে বসেছে। যখন তারা হকের দুশমনি আর বাতিলের দোস্তিকে এতটুকু পরিমাণে নিজেদের স্বভাবধর্মে পরিণত করেছিল যে, হক গ্রহণ করার যোগ্যতাই তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মানসিকতা নবীদেরকে এবং নবুওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে করতে এতটুকু বক্র হয়ে গিয়েছে যে, বংশানুক্রমে চলে আসা নবুয়তী যিম্মাদারী এবং ইলমে ইলাহীর মহামূল্যবান রত্নই চিরদিনের জন্য তাদের থেকে বিদায় নিয়েছিল। অথচ বংশানুক্রমে তা একজনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে হাত বদল হয়ে চলে আসছিল। বরং সেই বক্র মানসিকতার কারণে হককে তাদের কাছে বাতিল আর বাতিলকে হক বলে মনে হতে লাগল। কুরআনে কারীম নিম্নোক্ত বাক্যে যার চিত্রায়ণ করেছে এভাবে–

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ.

"আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখব, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায়। যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও

প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখেও তবুও সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলেই তা গ্রহণ করে নিবে। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে তারা ছিল গাফেল।"

(সূরা আ'রাফ-১৪৬)

## ইয়াহুদীরা এক বক্র মানসিকতা সম্পন্ন জাতি

ঐ বক্র মানসিকতার কারণেই যখন মাসীহে হেদায়াত [হযরত ঈসা আ.] তাদের সামনে আসলেন তখন তারা তাঁকে মাসীহে দালালাত (দাজ্জাল) মনে করল এবং তাকে হত্যা করে ফেলার ও শূলিতে চড়ানোর পাঁয়তারা করল। আর শেষ জামানায় যখন মাসীহে দালালাত (দাজ্জাল) আসবে তখন তাঁকে মাসীহে হেদায়াত মনে করবে এবং গোটা জাতি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার দলভুক্ত হয়ে যাবে।

অতএব, কুরআন তাদের যে লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের দাবী করেছে তা তাদের বদ্ধমূল ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাস, নিকৃষ্ট ও হীন চরিত্র এবং বদআমলের পরিণতি; কোন জাতির দুশমনি, তুচ্ছ-তাচ্ছিলের কারণে নয় বা এটা কারো অবমাননার পরিণতি নয়। এজন্য যদি প্রচলিত অর্থে তাদের নিজস্ব কোন জাগতিক প্রতিপত্তি, রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ হয় তবুও তাদের নিজস্ব কর্মদোষ প্রসূত লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্ব তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। একটি লাঞ্ছিত জাতি শক্তিশালী হয়েও লাঞ্ছিতই থেকে যায়, যদি তাদের ভেতরগত মন্দ হালগুলো বহাল থাকে। যেমন, একটি ভদ্র ও শরীফ খান্দান দুর্বল হয়েও ভদ্রই থেকে যায় যদি ভদ্রতার মূল শিকড় তাদের মধ্যে প্রোথিত থাকে।

## ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা অবসানের চারটি পন্থা

সর্বোপরি কুরআনের দ্বারা এতটুকু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইয়াহুদীদের পার্থিব সম্মান সেই লাঞ্ছনার একেবারেই পরিপন্থী নয়– যা কুরআন তাদের উপর আরোপ করেছে। তাছাড়া কুরআনই সেই লাঞ্ছনা অবসানের পদ্ধতিও তাদের বলে দিয়েছে। তারা সেই পদ্ধতির উপর চলে নিজেদের লাঞ্ছনার অবসান করতে পারবে। তন্মধ্যে একটি পন্থা حَبْلٌ مِّنَ اللّٰهِ এর অধীনে

আসে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাদের প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা ও পরোক্ষ লাঞ্ছনার একেবারেই অবসান ঘটবে। আর দু'টি সুরত حبل من الناس এর অধীনে আসে। এ দু'টোতে বহুলাংশে প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার অবসান ঘটবে; সেটা বৃহৎ কোন রাষ্ট্রক্ষমতার জিম্মি হয়েই হউক কিংবা বৃহৎ কোন রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যে তথাকথিত নামসর্বস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই হোক। চতুর্থ সুরত এই যে, সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে তারা স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনার আমূল অবসান ঘটাবে। এ ক্ষেত্রে কুরআন নিরবতা অবলম্বন করেছে এবং এই পদ্ধতিকে কালের বিভিন্ন অবস্থাদির উপর ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু হাদীসে নববী এ ব্যাপারেও স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে যে, এই পদ্ধতিটির বাস্তবায়নও সম্ভব। এমনকি এই সুরতের ব্যাপারে হাদীসে নববীর ভবিষ্যত বাণীও রয়েছে। "কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে এই সম্ভাবনা বাস্তবতা লাভ করবে। কিন্তু এটাও প্রকাশ করে দিয়েছে যে, যখন ইয়াহুদীদের স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার এই পর্যায় আসবে তখন এ পর্যায়টিই হবে সে জাতির চিরবিলুপ্তি ও স্থায়ীভাবে তাদের মূলোৎপাটনের সময়।" অর্থাৎ এটি শুধু তাদের লাঞ্ছনারই অবসান ঘটাবে না; বরং লাঞ্ছিত সেই জাতিরও অবসান ঘটাবে। এই শাসন ক্ষমতার উদাহরণ অনেকটা প্রদীপের শেষ হয়ে যাওয়ার সময় কেঁপে কেঁপে হঠাৎ ধপ করে জ্বলে উঠে চিরতরে নিভে যাওয়ার মত।

এর অর্থ হল লাঞ্ছনা ও অন্যের মুখাপেক্ষিতা এই সম্প্রদায়ের উপর এভাবে চেপে বসেছে যে, যতদিন তারা টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তা তাদের থেকে দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। কেননা, তারা নিজেদের মহৎ গুণাবলী ও যোগ্যতাকেই নিঃশেষ করে ফেলেছে। দাজ্জালের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে এই অবস্থা যখন আরো ফুলে ফেঁপে উঠবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই কায়েনাতকে অবশ্যই তাদের অধীন রাখবেন না। আর যখনই তারা এই অধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতার লাঞ্ছনা বিলুপ্ত করার জন্য একেবারে উঠে পরে লাগবে (যা দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় হবে) তখন তারা নিজেরাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু লাঞ্ছনার অবসান ঘটাতে পারবে না।

যেমন শরীয়ত আমাদেরকে আগাম অবগত করে দিয়েছে যে, "দুনিয়ার শেষ যুগে হযরত মাহদী আগমনের পর ইয়াহুদীরা নিজেদের এই পরাধীনতা; যা ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের মাধ্যমে তাদের উপর চাপানো হয়েছিল, তা

ভেঙ্গে ফেলার জন্য মুসলমান ও খৃষ্টান উভয়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে হযরত মাসীহ (ঈসা আ.)-এর মুকাবেলায় দাজ্জালের পক্ষাবলম্বন করবে। সে সময় নিজেদের এই নীচতা ও বক্র মানসিকতার কারণে মাসীহে হেদায়াত (ঈসা আ.)কে দাজ্জাল মনে করবে, আর মাসীহে দালালাত (দাজ্জাল)কে মনে করবে মাসীহে হেদায়াত।

সে সময়ের চিত্র হবে এমন যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর কাছে তাঁবুতে সাকীনাহ বা শান্তির প্রতীকী সিন্ধুক উদ্ভাসিত হবে। যাতে মুসা (আ.)-এর বরকতময় কিছু জিনিস যথা : লাঠি, তাওরাত-এর তখ্তিসমূহ প্রভৃতি রক্ষিত থাকবে। যে সব মানুষের অন্তরে অনু পরিমাণ সৌভাগ্য বিদ্যমান থাকবে তারা এ সকল বরকতময় নিদর্শনাবলী দেখে মাহদীর হাতে ঈমান এনে ইসলামের চৌহদ্দীতে প্রবেশ করবে। আর অবশিষ্ট সবাই সংঘবদ্ধভাবে দাজ্জালের পক্ষাবলম্বন করবে।

এদিকে ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পর (যিনি তখন ইসলামের মুজাদ্দিদ হিসাবে আগমন করবেন) সমস্ত খৃষ্টান জগত মাসীহ (আ.)-এর হাতে ঈমান এনে ইসলামে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে কুরআনে আগাম ভবিষ্যত বাণী রয়েছে।

সে সময় ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের মধ্যকার এই বিভাজন যে, মুসলমানরা ছিল ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী আর খৃষ্টানরা ছিল জাতিগত পরিচয়ে ঈসা (আ.)-এর অনুসারী– মিটে গিয়ে সকলেই মুসলমান হিসাবে ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী হয়ে যাবে। আর ইয়াহুদীদের খৃষ্টানদের অধীন থেকে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হওয়ারও কোন অবস্থা থাকবে না, বরং ইয়াহুদীরা ঈসা (আ.)-এর এই সম্মিলিত অনুসারীদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দাজ্জালী শক্তির তত্ত্বাবধানে সামনে অগ্রসর হবে এবং সর্বশেষ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবে।”

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, এই পরাধীনতা যেহেতু কোন জাতির দুশমনি বা শত্রুতার কারণে আরোপিত হয়নি, বরং খোদার পক্ষ থেকে তাদের বিকৃত মানসিকতার কারণে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাই ইয়াহুদীদের এই মুকাবেলা প্রকারান্তরে খোদার সাথে মুকাবেলা হিসাবেই পরিগণিত হবে। অতএব, এক্ষেত্রে তাদের কামিয়াব হওয়ার কিংবা আশ্রয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

এজন্য দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর একের পর এক ইয়াহুদীরা মৃত্যুর ঘাটে উপনীত হতে থাকবে; বরং হাদীসের স্পষ্টভাষ্য মুতাবেক যদি কোন ইয়াহুদী কোন পাথরের আড়ালেও আশ্রয় নেয় তাহলে পাথর থেকেও আওয়াজ আসবে, "খোদার দুশমন ইয়াহুদী এখানে, একে হত্যা কর।" এজন্য ইয়াহুদীদের কোন একজন প্রাণধারীও ইয়াহুদী হিসাবে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারবে না।

বস্তুত এই শরয়ী চিত্রায়ণ থেকে এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালের ফেতনার সময় ইয়াহুদীদের একটি শাক্তিশালী সংঘবদ্ধ শক্তি গড়ে উঠবে। যার নেতা হবে দাজ্জাল। শরীয়তের ভাষ্যানুযায়ী এটা এদের রাজনৈতিক শক্তির দলীল। এ সময় তাদের কাছে প্রচুর সমরাস্ত্র থাকবে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর তারা প্রভাব বিস্তার করবে। তদুপরি হাদীসে নববী এই সংবাদও দিয়েছে যে, সত্তর হাজার ইয়াহুদী তায়ালিস্তান (এক ধরনের সামরিক পোশাক) পরিধান করে দাজ্জালের মদদের জন্য ইস্পাহান থেকে অভিযান শুরু করবে। শরীয়তের ভাষ্যানুযায়ী এটা তাদের সমর শক্তির দলীল। এই শক্তির সহায়তায় দাজ্জাল গোটা দুনিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। শুধু হারামাইন শরীফাইন ছাড়া সমগ্র দুনিয়া জুড়ে সে ভ্রমণ করবে। শরীয়তের ভাষ্যানুযায়ী এটা তার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত শক্তির দলীল। এজন্য তার নাম হয়েছে 'মাসীহ' (বিশ্ব পরিব্রাজক বা বিশ্ব ভ্রমণকারী)। কারণ, সে গোটা দুনিয়া ভ্রমণ করবে।

বিশ্বব্যাপী এই ভ্রমণের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত শক্তি হিসাবে তার হাতে কিছু অলৌকিক ও বিস্ময়কর ক্ষমতাও থাকবে। তবে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এটা নয়।

ইয়াহুদীদের এই শক্তি নিঃসন্দেহে স্ব-অর্জিত ও স্বনির্ভর হবে। কারণ, তারা যাদের অধীন ছিল সেই খৃষ্টানরা তখন মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের থেকে মদদ লাভ করার কোন প্রশ্নই তখন থাকবে না। তাছাড়া পুরাতন মুসলমানদের থেকে মদদ লাভ করা কিংবা তাদেরকে মদদ করার কোন অর্থই হয় না। অতএব, এই উভয় জাতি থেকে আলাদা হয়ে দাজ্জালের ভরসায় তারা স্বনির্ভর শক্তি অর্জন করবে এবং তারা পুরাতন মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী নব্য মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসাবে মুকাবেলায় আসবে।

তবে এমনিতে একে 'শাসন ক্ষমতা' ও 'লাঞ্ছনার অবসান' বলা যায় না। কারণ, এটা ক্ষমতা অর্জনের একটি প্রচেষ্টা মাত্র, স্বয়ং কোন ক্ষমতা নয়। বরং ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে এটি একটি 'বিদ্রোহ' হিসাবে বিবেচিত হবে; যা সফল হওয়ার পরই কেবল ক্ষমতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সফল হওয়ার পূর্বে বিদ্রোহ ও দ্রোহিতাকে কেউ ক্ষমতা বলে না। বিদ্রোহের সময়ও যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয় ক্ষমতা তারই হাতে আছে বলে ধরা হয় এবং তারই নামের উপর তা কায়েম থাকে। বিদ্রোহী যখন তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে স্বয়ং তার স্থান দখল করে নেয় এবং ক্ষমতা নিজ হাতে উঠিয়ে নেয় কেবল তখনই এটাকে বিদ্রোহীর ক্ষমতা বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানের সুরতহাল তার সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। কারণ, ইয়াহুদী সম্প্রদায় এই প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ক্ষমতা লাভের পূর্বেই তাদের প্রধান সহায়ক (প্রতিশ্রুত দাজ্জাল)সহ মৃত্যুবরণ করবে। তাহলে এটা ক্ষমতা হল কিভাবে? আর ক্ষমতা প্রত্যাশীরাই যখন দুনিয়াতে থাকবে না তখন ভবিষ্যতে ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনাটুকুই বা কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? এজন্য ইয়াহুদীদের সেই লাঞ্ছনা ও অবমাননা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে তা বিদ্রোহকালীন সময়েও বিন্দুমাত্র অপসারিত হবে না। অতএব লাঞ্ছনা ও অবমাননার কুরআনী মূল্যায়ন সে অবস্থায়ও যথোচিত কায়েম থাকবে।

হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী এই দাজ্জালী হাঙ্গামা ও শোরগোল মাত্র চল্লিশদিন স্থায়ী হবে। যদি বর্তমান পৃথিবীর বিশ্বযুদ্ধগুলোর মত দু'চার বছরও স্থায়ী হত তবুও না হয় এ কথা বলা যেত যে, ইয়াহুদীরা তো দু'চার বছর স্বাধীন ক্ষমতার সাথে কাটিয়ে দিয়েছে! কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের মেয়াদ কোন উল্লেখযোগ্য মেয়াদই নয়। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত এই মেয়াদের যুদ্ধকে যুদ্ধই বলা হয় না বরং এটা তো 'খণ্ড যুদ্ধ' বা 'মোরগ লড়াই' মাত্র। তারপরও বিদ্রোহের প্রচেষ্টা যতটুকু হবে তাতেও ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের অবস্থা এমন হবে যে, হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী প্রতিটি ইট, পাথর এমনকি পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই তখন ইয়াহুদীদের শত্রুতায় অনুপ্রাণিত হবে। যার দরুন সেই চল্লিশদিনেও ক্ষমতার স্বাদ তারা পাবে না, বরং প্রতিটি ইট

থেকে তাদের লাঞ্ছনার এ'লান হতে থাকবে এবং সে সময় ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের এই দুই দলকে এক দলে পরিণত করে ইয়াহুদীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে করে তথাকথিত স্বাধীন ক্ষমতায়ও যা দাজ্জালের পৃষ্ঠপোষকতায় কায়েম হবে– ইয়াহুদীদের স্বস্তি নসীব হবে না।

বাস্তব সত্য এই যে, ইয়াহুদীরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট হযরত ঈসা (আ.)কে দিয়েছে। তারা ঈসা (আ.)কে হত্যা ও ফাঁসি দেওয়ার সাযেশ ষড়যন্ত্র করেছে, তাঁর উপর বিভিন্ন অপবাদ দিয়েছে। এরপর সবচেয়ে বেশি কষ্ট তারা হযরত নবী করীম (সা.)কে দিয়েছে। হুজুর (সা.)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, মদীনায় আক্রমণ করার জন্য মক্কার পৌত্তলিক কাফেরদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে, বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করেছে।

এক কথায় তারা হুজুর (সা.)-এর মদনী জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। এজন্য এই মহান দুই নবীর অনুসারীরা শেষ জামানায় 'দুই দেহ এক প্রাণ' হয়ে ইয়াহুদীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবে। যাতে করে এই পবিত্র ব্যক্তিদের প্রতিশোধ তাদের কওমের মাধ্যমে হয়ে যায়। আর এই 'প্রতিশোধ গ্রহণ মিশন'-এর প্রধান হবেন হযরত ঈসা (আ.)। যিনি নবী (সা.)-এর নায়েব ও ইসলামী সংস্কারক হিসাবে এই 'ইয়াহুদী নেতা' দাজ্জালের মূলোৎপাটন করবেন। এতে ইয়াহুদীয়্যাত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াহুদীরা যাদের বেশি কষ্ট দিয়েছে তাদেরকেই যেন আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদানের জন্য ময়দানে উপস্থিত করবেন। আর আল্লাহ তা'আলার এই নিম্নোক্ত ওয়াদা সেই সময়ও বহাল থাকবে।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত এমন সম্প্রদায় প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে জঘন্য শাস্তি আস্বাদন করাতে থাকবে। তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে অতি কঠোর। তবে তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে এই ওয়াদা ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে বিমূর্ত ছিল; আর শেষ যুগেও যুদ্ধের মাধ্যমে ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের যুদ্ধংদেহী আচরণের মাঝ দিয়ে কায়েম থাকবে।

অতএব, দুনিয়াতে 'লাঞ্ছনার অবসান' ও 'ক্ষমতার্জনের' দু'টি মাত্র সুরতই হতে পারে। এর একটি হল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ক্ষমতা যা সত্য গ্রহণ ও সত্যানুসরণের মাধ্যমে অর্জন হয়। তবে ইয়াহুদীরা এই যোগ্যতা চিরতরে বিনাশ করে দিয়েছে বিধায় এ জাতীয় ক্ষমতা লাভের প্রশ্নই আসে না। তাই কুরআনে কারীম فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ (তারা অল্পই ঈমান আনবে) বলে এর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়টি হল পরনির্ভরতা মুক্ত জাগতিক ক্ষমতা ও পার্থিব শক্তি। কুরআনে কারীমের ভাষ্যানুযায়ী এটা নিষিদ্ধ নয় বটে, তবে হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী এটা লাভ হবে, কিন্তু তা মাত্র কিছু দিনের জন্য; তাও আবার চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব লক্ষণ রূপে। যেমন দাজ্জালের আগমনের সময় প্রতীয়মান হবে।

সুতরাং স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা যেমন দাজ্জালের আগমনের পূর্ব যুগেও অনুপস্থিত ছিল (বর্তমান ইয়াহুদীরা সেই পূর্বযুগ অতিবাহিত করছে)। কারণ, তারা ইতোপূর্বে খৃষ্টানদের প্রভাব ও শাসনাধীন এবং তাদের মুখাপেক্ষী ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তেমনি দাজ্জালের আগমনের পরও অনুপস্থিত থাকবে। কারণ, দাজ্জালের চল্লিশদিন ব্যাপী বিদ্রোহ প্রচেষ্টায়ও ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা তাদের মুকাবেলা করে পরাভূত করবে এবং পরিণতিতে বিজয় অর্জন করবে। আর এর মধ্য দিয়ে ইয়াহুদী সম্প্রদায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে।

অতএব, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য আরোপিত সেই লাঞ্ছনা ও নিকৃষ্ট শাস্তির ওয়াদা আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে এবং দাজ্জালের সময়ও তথৈবচ বহাল থাকবে।

## ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের রাজপ্রতাপের বিরুদ্ধে দ্রোহিতা ইয়াহুদীদের জন্য মৃত্যু সমতুল্য

মোদ্দাকথা, এই লাঞ্ছনা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত এবং এতে বান্দার কোন দখল নেই, তখন এটা অপসারণের জন্য আল্লাহর মুকাবেলা কে করতে পারে? এজন্য এটাই বলা হবে যে, ইয়াহুদীদের

আত্মনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা তদবীরের কোন এক সময় যদি এমন এসেও যায়– যখন তাদের ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের থেকে মদদের কোন প্রয়োজন হবে না, তাহলে তখন আল্লাহর সাথে মুকাবেলা হওয়ার কারণে সেটাই হবে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি ও মূলশুদ্ধ বিনাশ হওয়ার সময়।

এক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ সেই অবাধ্য ও পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী গোলামের ন্যায়, যে বিদ্রোহ করে মুনিবের মুকাবেলায় এসে দাঁড়ায় এবং নিমক হারামী করে তার স্থান দখল করতে চায়। কিন্তু মুনিব স্বীয় বল প্রয়োগ করে তার বিদ্রোহমূলক বাহ্যাড়ম্বরতাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়। সুতরাং গোলামের এই কিছু দিনের দ্রোহিতাকে গোলামের ক্ষমতা বলা যায় না, বরং একে গোলামের অবাধ্যতা ও মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার কসরত নামে অভিহিত করা যায়।

সুতরাং এ থেকেও ইয়াহুদীদের সম্মানিত হওয়া কিংবা তাদের লাঞ্ছনার অবসান হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না বরং ইয়াহুদীদের উপর ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতএব, কুরআনী ব্যাখ্যার আলোকে ইয়াহুদীদের উপর ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকা এবং ইয়াহুদীদের পরাজিত ও পরাস্ত থাকার বিষয়টি সে সময়ও প্রতিষ্ঠিত ছিল; যখন ইসরাইল রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না; আর আজও প্রতিষ্ঠিত আছে যখন ঈসা (আ.)-এর নামসর্বস্ব অনুসারীরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইয়াহুদীদেরকে তাদের অপকর্মের ক্রীড়নক হিসাবে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং পরবর্তীতেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে যখন তারা ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দাজ্জালের তত্ত্বাবধানে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবে এবং মাত্র চল্লিশ দিনেই দাজ্জালসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত তিন অবস্থাতেই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরই থাকবে। এজন্য আজ যদি ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের প্রহসনমূলক ক্ষমতার প্রদর্শনী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে এটাকে আপনি ইয়াহুদীদের ক্ষমতা অর্জন কিংবা তাদের লাঞ্ছনার অবসান বলে মনে করবেন না এবং কোনরূপ সন্দিহান হবেন না। কেননা, এসব কিছু বৃটেন, আমেরিকা

ও অন্যান্য খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় হচ্ছে। ইয়াহুদীরা শুধুই উপলক্ষ মাত্র। যেমন– পূর্বে এ ব্যাপারে স্বয়ং খৃষ্টানদের কিছু কিছু স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা নিজেদের কিছু ঘৃণ্য স্বার্থের কারণে মুসলমানদেরকে বিশেষত আরবদেরকে হেয় ও দুর্বল করার জন্য ইয়াহুদীদের ফিলিস্তিনে বসিয়েছে এবং তারা নিজেরাই একে ইয়াহুদী রাষ্ট্র নামে অবিহিত করেছে। আবার তারা নিজেরাই এদেরকে স্বীয়শক্তির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে। যেন পর্দার অন্তরালে থেকে আরবদের শক্তি ক্ষয় করা যায় এবং তাদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করে মিডলইস্টে (মধ্যপ্রাচ্যে) নিজেদের মনমত শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়।

এটা স্পষ্ট যে, ইয়াহুদীদের এমন কোন শক্তি বা খোদ-মুখতার স্বাধীন ক্ষমতা নেই যার ভিত্তিতে তথাকথিত এই রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কিংবা ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের অধীনতা মুক্ত রাষ্ট্র বলে মনে করা যেতে পারে।

## ইসরাইল কোন বিচারেই বৈধ রাষ্ট্র নয়

এতটুকু কথা স্পষ্ট যে, ইয়াহুদীদের বর্তমান তথাকথিত রাষ্ট্র অবৈধ ও অসাংবিধানিক। এ রাষ্ট্র ভেঙ্গে দেয়াই নিষ্ঠাবান পৃথিবীর সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত। কেননা, অন্যের ধ্বংসাবশেষের উপর নিজের ভিত্তি স্থাপন করাকে ডাকাতি কিংবা চুরি ছাড়া আর কি উপাধি দেয়া যেতে পারে?

বৃটেন সিঁদেল চোরের ন্যায় সিঁদ কেটেছে। আমেরিকা ডাকাতের মত মাল বের করেছে। ইয়াহুদীরা তস্কর সর্দারের মত তা নিয়ে রেখে দিয়েছে। আর জাতিসংঘ কাফন চোরের মত এর উপর প্রত্যয়ণের মোহর এঁটে দিয়েছে। অতএব চোর, ডাকাত তস্কর সরদার এবং কাফন চোরদের অর্জনকৃত সম্পদকে বৈধ সম্পদ বলা যায় কি করে? যদি পৃথিবীর কোন নিরপেক্ষ আদালতে এই ঘটনার মুকাদ্দমা দায়ের করা হয় তাহলে এসব লুণ্ঠনকারীদের উপর অপরাধের দাগ লাগানো হবে না কি? সময় আসলে এরা সবাই পর্যায়ক্রমে শাস্তির যোগ্য অপরাধী হিসাবে অবশ্যই শাস্তি পাবে? এ ভূখণ্ডের প্রকৃত মালিক (আরবদের)কে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পণ করা অবশ্যই ইনসাফের দাবী।

মোটকথা, পূর্বের আলোচনার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এই অবৈধ সম্পদ বেশি দিন লুণ্ঠনকারীদের হাতে থাকবে না। স্বয়ং ইয়াহুদীদের ইতিহাস থেকেও এটাই অনুমিত হয়।

তাছাড়া কুরআনে হাকীমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বুঝা যায় যে, যেহেতু ইয়াহুদীদের উপর বিশেষভাবে লাঞ্ছনা আরোপ করা হয়েছে; সেটা যদি পরোক্ষ লাঞ্ছনাও হয়, তবুও গোটা জাতি থেকে তা অপসারিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা, কুরআনই বলে দিয়েছে فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যকই ঈমান আনবে। এজন্য তারা নিজেদের এই হাজার বছর বয়সে সর্বদা জাগতিক দিক দিয়ে গড়ে উঠতে উঠতেও ভেঙ্গে পড়েছে। বনী ইসরাঈলের দীর্ঘ ইতিহাস এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে, যখনই তারা গড়ে উঠেছে তখনই সেটা তাদের ভাঙ্গার ভূমিকা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

অতএব, এই অনুমান করা মোটেই কঠিন কিছু নয় যে, শেষবার যখন তারা পরিপূর্ণ জাগতিক শক্তিতে বলীয়ান হবে তখন শেষবারের মত তারা চিরদিনের তরে ভেঙ্গে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যেমন পূর্ববর্তী আলোচনায় দাজ্জালের আগমনের বিবরণে তা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

## ইয়াহুদীদের শাসন ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া একটি গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত, এটা কুরআনের নস্ বা সুস্পষ্ট ভাষ্য নয়

ইয়াহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কিত পূর্বোক্ত মূল তত্ত্বসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে যাওয়ার পর এখন যদি কোন মুফাস্সির ইয়াহুদীদের উপর আরোপিত লাঞ্ছনার অর্থ এটা মনে করেন যে, "পৃথিবীতে কখনোই ইয়াহুদীদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে না।" তাহলে সেটা শুধু জিল্লত শব্দের ইস্তিমবাত (গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত) হবে মাত্র, সরীহ নস্ (কুরআনের সুস্পষ্টভাষ্য) নয়। আর যদি জিল্লতের অর্থ এই গ্রহণ করা হয় যে, পৃথিবীতে তাদের এরূপ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রক্ষমতা কখনই অর্জিত হবে না– যার ভিত্তিতে ইয়াহুদীরা পূর্ণ ক্ষমতাবান হবে এবং তারা ইচ্ছা করলে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিসমূহ তথা বৃটেন, আমেরিকার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণার সাহস পাবে– তাহলে এটাও ইসতিমবাত বা গবেষণালব্ধ মতামতই হবে; মনসূস বা সুস্পষ্ট ভাষ্য বলা যাবে না। অথচ এমন শাসন ব্যবস্থা না কুরআনের আলোকে অসম্ভব আর না হাদীসের ভাষ্যের আলোকে অসম্ভব।

কিংবা এটাকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলতে হবে, যা ইয়াহুদীদের পুরানো ইতিহাসের আলোকে গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, তারা বারংবার সংগঠিত হতে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। অতএব, ভবিষ্যতেও তারা ভেঙ্গে চুরমার হবে এবং কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে সংগঠিত হতে পারবে না। কিংবা এটাকে দাজ্জালের সময়কার ঘটনার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বলতে হবে। অর্থাৎ ইয়াহুদীরা সেই চল্লিশ দিনের ভেতরে অবশ্যই সুসংহত ও সুসংগঠিত হবে এবং দাজ্জালের নেতৃত্বে গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে মুকাবেলা করবে। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সেটা কোন রাষ্ট্র ক্ষমতা হবে না বরং ক্ষমতার্জনের প্রচেষ্টা হবে মাত্র এবং এ প্রচেষ্টা পরিণতিতে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে।

অতএব, উক্ত মুফাস্‌সিরদের অভিমতেরও একটি ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে যা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করার মত নয়। তবে আমাদের শুধু এতটুকু প্রমাণ করা দরকার যে, ইয়াহুদীরা যদি জাগতিকভাবে শক্তিশালী হয়েও যায় তবুও কুরআনের বক্তব্যের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না। আর যদি কিয়ামত পর্যন্ত জাগতিকভাবে শক্তিশালী নাও হয় তাহলেও কুরআনের দাবীর বিপরীত কিছু প্রমাণিত হবে না। তাছাড়া ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ঘটনাকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎবাণী করার পথ কুরআন রুদ্ধ করেনি। অতএব, এসব বিচারে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোন বক্তব্য পেশ করা হলে তাও কুরআনের সত্যাশ্রিত মূলনীতির উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

**উপসংহার** পূর্বের তাবৎ আলোচনার সর্বশেষ ফলাফল এই যে, কুরআনে কারীম ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনার ঘোষণা দিয়েছে, তবে তাদের জাগতিক শক্তি কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে কি না এ ব্যাপারে কোন ঘোষণা দেয়নি। হ্যাঁ, এর তদবীর বলে দিয়েছে। অর্থাৎ যদি ইয়াহুদীরা حبل من الله এর অধীনে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন লাঞ্ছনাই আর থাকবে না। উপরন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থাই তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হবে। তবে এক্ষেত্রে তাদের ইয়াহুদী পরিচয় আর থাকবে না।

আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে حبل من الناس এর অধীনে যদি জিযিয়া দিতে রাজী হয় তাহলে সামষ্টিক কোন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে না বটে; কিন্তু জিম্মি হিসাবে ইসলামী শাসনের ছত্রছায়ায় সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন লাভ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদের পরোক্ষ লাঞ্ছনা বহাল থাকলেও প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা বহুলাংশে লোপ পাবে। তদুপরি পূর্ণ নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক অবমাননা থেকেও বেরিয়ে আসতে পারবে।

কিন্তু যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে আর রাষ্ট্রীয় সংবিধানের খেলাফ না করার এবং কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ লাঞ্ছনা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাবে বটে কিন্তু পরোক্ষ লাঞ্ছনা পূর্ববৎ বহাল থাকবে। এমনকি এ ধরনের চুক্তি যদি মুসলমানদের সাথে না করে কোন বৃহৎ শক্তির সাথে করে তাহলেও সেটা حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ এরই একটি পর্যায় হবে। কেননা, কুরআনে حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ আয়াতাংশে نَاسٌ (মানুষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে حَبْلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ব্যবহার করা হয়নি।

আর যদি তারা ইসলামও গ্রহণ না করে, জিযিয়া দিতেও রাজী না হয় এমনকি উপরোক্ত অঙ্গীকার ও চুক্তি থেকেও বিমুখতা প্রদর্শন করে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ জাগতিক ও সামষ্টিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে, তাহলে তারা এ জাতীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কি পারবে না এ ব্যাপারে কুরআন কোন মন্তব্য করেনি, বরং বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে যুগের ঘটনা প্রবাহের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

বস্তুত, কুরআন তার আপন স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে এ জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকে। বিস্তারিত তাফসীর ও গৌণ বিষয়ের আনুপূর্বিক বর্ণনা জানতে হলে হাদীসের দ্বারস্থ হতে হয়। তো এক্ষেত্রে বিভিন্ন হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইয়াহুদীদের এ জাতীয় সামষ্টিক ক্ষমতাও অসম্ভব নয়; বরং দাজ্জালের আগমনের মুহূর্তে এর কিছুটা বাস্তবায়ন দেখা যাবে। কিন্তু ইয়াহুদীদের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শরীয়তের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এমন অনুমান করাটাও কঠিন কিছু নয় যে, ইয়াহুদীদের এ জাতীয় ক্ষমতা কিছুদিনের জন্য হবে মাত্র; তাও

আবার সেই মুহূর্তটিই হবে তাদের চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার মুহূর্ত। যেমন, দাজ্জালের সময় চল্লিশ দিন ব্যাপী ক্ষমতার্জনের এক হাঙ্গামার উদ্ভব হবে। তারপর চিরদিনের জন্য দাজ্জাল ও ইয়াহুদীরা বিনাশ হয়ে যাবে।

বর্তমান ইসরাঈলের অস্তিত্বকে যদি সেই সর্বশেষ দুর্ঘটনার ভূমিকা বলা হয় তাহলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, হাদীসের সব স্পষ্ট ভাষ্যগুলো একত্র করে বিশ্লেষণ করলে সেই বাস্তবতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

উপরোক্ত চার সুরতের কোন সুরতই কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্যের খেলাফ নয়। তবে কুরআন এ সকল অবস্থা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেনি। শুধুমাত্র বুনিয়াদী তদবীর বর্ণনার মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। আর এটাই কুরআনের মৌলিক বর্ণনা-রীতির শান।

আশা করি যে, এ লেখাগুলো পড়ে যাদের অন্তরে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর যে সকল সন্দেহ সংশয়ের উদয় হয়েছিল, সেগুলোর অবসান ঘটবে এবং তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত যে, ইয়াহুদীদের কোন অবস্থাই চাই আজকের হোক কিংবা সুদূর ভবিষ্যতের হোক, কুরআনের খেলাফ তো হবেই না; এমনকি এর দ্বারা কুরআনের সত্যতার উপর সামান্য আঁচড়ও লাগবে না।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রহ.)

প্রিন্সিপাল. দারুল উলূম দেওবন্দ।

*সমাপ্ত*

## আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি তাজা গ্রন্থ